খাতের চিহ্ন আছে, উহা "ডিঙি ডোবার খাত" নামে প্রসিদ্ধ। স্থানীয় লোকেদের বিশ্বাস যে এই স্থানেই পূর্ব্বোক্ত ধনীর নৌকা ডুবিয়াছিল।

শারদীয়া শুক্ল একাদশী তিথিতে উত্তরবাহিনীর নবঘট পূজা উপলক্ষে শিয়াখালায় একটি মেলা হয়।

পূর্ব্বে শিয়াখালায় পুরন্দর গড় নামে একটি গড়ের চিহ্ন দেখা যাইত। বর্ত্তমানে উহা কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এই স্থানে গোপীনাথ বসু বা পুরন্দর খাঁর বাটী ছিল। পুরন্দর খাঁ ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি যুদ্ধ বিদ্যায়ও বিশেষ নিপুণ ছিলেন। কথিত আছে যে তৎকালীন শিয়াখালার অরণ্যনিবাসী জনৈক অর্দ্ধ স্বাধীন নৃপতিকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তিনি শিয়াখালা অধিকার করেন এবং স্বনামে পুরন্দরপুর বা পুরন্দর গড়ের প্রতিষ্ঠা করেন। পুরন্দর খাঁ একজন বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক ছিলেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত কতকগুলি কুলবিধি এখনও দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে প্রচলিত আছে।

শিয়াখালার নিকটবর্ত্তী **ফুর্‌ফুরা** মুসলমানগণের একটি বিখ্যাত পীরস্থান।



পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথে বাংলা দেশ

পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথ খুলিবার পূর্ব্বে বাংলা দেশে একমাত্র নদী পথেই দূরস্থ স্থানে যাইতে হইত। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কলিকাতা ও গৌহাটির মধ্যে বড় বড় নৌকাতেই যাতায়াত করিতে হইত, ইহাতে ৬।৭ সপ্তাহ লাগিত। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি কলিকাতা ও গৌহাটির মধ্যে স্টীমার চালাইবার ব্যবস্থা করেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে সরকারের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া ইণ্ডিয়া জেনারল্ ন্যাভিগেশন কোম্পানি কলিকাতা এবং আসাম উপত্যকার মধ্যে দুইখানি স্টীমার চালাইতে থাকেন; ছয় সপ্তাহ অন্তর স্টীমার ছাড়িত। তখন হইতে সরকারী স্টীমার উঠাইয়া লওয়া হয়। ইহাই পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের স্টীমার পথগুলির সূত্রপাত।

বেশী দিন নয়, একশত বৎসর পূর্ব্বেও এ দেশে রেলের কথা কেহ শুনে নাই। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রথম রেল চলিয়াছিল। ভারতবর্ষে প্রথম রেল খোলা হয় ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ১৬ই এপ্রিল অর্থাৎ এখন হইতে ৮৬ বৎসর পূর্ব্বে। বোম্বাই হইতে মাত্র ২৪ মাইল দূর "থানা" স্টেশনে গিয়া এই লাইন শেষ হয়। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে প্রায় ৫৮ হাজার মাইল পথ রেলে বাঁধা পড়িয়াছে। প্রতি বৎসর প্রায় ৫৮ কোটি যাত্রী ও ২ হাজার কোটি টন (১ টন—২৭৷৷০ মণ) মাল রেলে যাতায়াত করে।

বোম্বাই-থানা লাইন খোলার চার বৎসর পরে (১৮৫৭) "ঈস্টর্ণ্ বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি" কলিকাতা হইতে কুষ্টিয়া পর্য্যন্ত ১১১ মাইল রেল পথ খুলিবেন স্থির করেন। এই কোম্পানির সহিত সরকারের চুক্তি হয় যে তাঁহারা কুষ্টিয়াতে পুল বাঁধিয়া ঢাকা পর্য্যন্ত লাইন লইয়া যাইবেন। তখন পদ্মা কুষ্টিয়ার ধার দিয়া প্রবাহিত ছিল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে এই লাইনে প্রথম গাড়ী চলে। তখন কুষ্টিয়াই পূর্ব্ববঙ্গ রেলের শেষ সীমা ছিল। ইতিমধ্যে পদ্মা দূরে সরিয়া যায় এবং পুল বাঁধা অসম্ভব হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে রেল গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ও সেখান হইতে স্টীমারে করিয়া ঢাকা এবং পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য স্থানে যাইবার ব্যবস্থা হয়।

কুষ্টিয়া লাইনের পরেই কলিকাতা-ক্যানিং লাইন খোলা হয়। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ হইতে আশঙ্কা হইতেছিল যে ভাগীরথীতে পলি পড়ায় কলিকাতার বন্দর বেশীদিন চলিবে না, সেই জন্য কলিকাতা হইতে বন্দর সরাইয়া ক্যানিং শহরে লইয়া যাওয়া স্থিরীকৃত হয়। ফলে "কলিকাতা ও সাউথ্ ঈস্টর্ণ্ রেলওয়ে কোম্পানি" নামে একটি ব্যবসায়ীসঙ্ঘ

কলিকাতা হইতে ক্যানিং পর্য্যন্ত লাইন নির্ম্মাণ করেন। ১৮৬২-৬৩ খৃষ্টাব্দে এই লাইনের কার্য্য শেষ হয়। কিন্তু কার্য্যকালে লাইনের আয় এত অল্প হয় যে শেষে ঐ কোম্পানি চুক্তিমত গভর্ণমেন্ট্কে লাইন বিক্রয় করিয়া দেন। পরে অবশ্য কলিকাতা বন্দর পরিবর্ত্তনের সঙ্কল্প বদ্‌লাইয়া যায়। একদিক দিয়া এই লাইনের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। ভারতবর্ষের মধ্যে ক্যানিং লাইনই প্রথম সরকারী তত্ত্বাবধানে আসে। এখন সেই জায়গায় চারটি বড় বড় লাইন সরকারের (State) তত্ত্বাবধানে চলিতেছে; যথা—ঈ আই, জি আই পি, এন্ ডব্লিউ এবং ঈ বি রেলওয়ে।

ডায়মণ্ডহারবার লাইন ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে খোলা হয়। ইহারও মূলে সেই বন্দর স্থানান্তরিত করিবার ইচ্ছা ছিল। সরকার মনে করিয়াছিলেন সমুদ্রের কাছে কোনও শহরে বন্দর স্থাপিত হইলে সকলদিকে সুবিধা হইবে। কিন্তু যে সময়ে এই লাইনে গাড়ী চলিল তখন মত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এই লাইনটি যে অঞ্চল দিয়া গিয়াছে তাহার চারিদিকে প্রচুর ধান জন্মায়। ধান-চালানীর কাজে এই লাইন যথেষ্ট উপকারে আসিতেছে।

কুষ্টিয়া, ক্যানিং ও ডায়মণ্ডহারবার লাইন ছাড়া সরকারী প্রচেষ্টায় নর্দার্ণ্ বেঙ্গল রেলওয়ে খোলা হয়। ১৮৭৫-৭৭ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। দুর্ভিক্ষ নিবারণকল্পে উত্তরবঙ্গে এই লাইনের সৃষ্টি। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে লাইন পাতা শেষ হয় ও গাড়ী চলিতে সুরু করে। নর্দার্ণ্ বেঙ্গল রেলে সাঁড়া হইতে শিলিগুড়ি এবং পার্ব্বতীপুর হইতে একদিকে দিনাজপুর ও অপরদিকে কাউনিয়া পর্য্যন্ত প্রথম গাড়ী চলিয়াছিল। এই রেল মাঝারি মাপে (Metre Gauge) পাতা হয়। অনেকে জানেন না যে চট্টগ্রাম হইতে সুদূর আমেদাবাদ পর্য্যন্ত ১৭৬১ মাইল পথ এই মাপের (Metre Gauge) লাইন ধরিয়া যাওয়া যায়। আজকাল দুইখানি ট্রেন নিয়মিতভাবে এই লাইন দিয়া আমিনগাঁ হইতে লক্ষ্ণৌ ও এলাহাবাদ পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতেছে।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ঈস্টর্ণ্ বেঙ্গল রেলওয়ে সরকারের হাতে আসে এবং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে সরকার নারায়ণগঞ্জ হইতে ঢাকা হইয়া ময়মনসিংহ পর্য্যন্ত একটি মাঝারি মাপের লাইন খুলেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল তারিখে এই লাইনটি, নর্দার্ণ্ বেঙ্গল রেলওয়ে ও অন্য কয়টি লাইন ঈস্টর্ণ্ বেঙ্গল রেলওয়ের সহিত একত্র হইয়া "ঈস্টর্ণ্ বেঙ্গল স্টেট্ রেলওয়ে" নামে অভিহিত হয়। এন্ ডব্লিউ রেলওয়ে প্রমুখ সরকারী

তত্ত্বাবধানে পরিচালিত অন্যান্য রেলওয়ে সমূহের নামকরণের সহিত সামঞ্জস্য বিধানকল্পে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে "স্টেট্" কথাটি উঠাইয়া দেওয়া হয়।

তারপর বছরের পর বছর কাটিয়াছে, কুচবিহার, ধুব্ড়ী, আমিনগাঁ, সিরাজগঞ্জ, খুলনা, ফরিদপুর প্রভৃতি বহুদূর ও বহুদিক বিস্তৃত জেলা ও পরগণাগুলি একই লৌহবর্ত্মে বাঁধা পড়িয়া পরস্পরের নিকটতর হইয়া উঠিয়াছে। যেখানে সম্ভব সেইখানে নদ-নদীর পুল বাঁধা হইয়াছে অথবা রেলেরই খেয়া-জাহাজের ব্যবস্থা হইয়াছে।

যে পদ্মার ভাঙ্গার খেলায় সকলেই সদা সন্ত্রস্ত থাকে, আজ সেই দুরন্ত পদ্মার বুকেও লৌহের বন্ধনী পড়িয়াছে। সাঁড়ার হার্ডিং পুল (১৯১৫ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত) জগতে স্থপতি বিদ্যার এক অত্যুজ্জ্বল কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে দাঁড়াইয়া আছে।

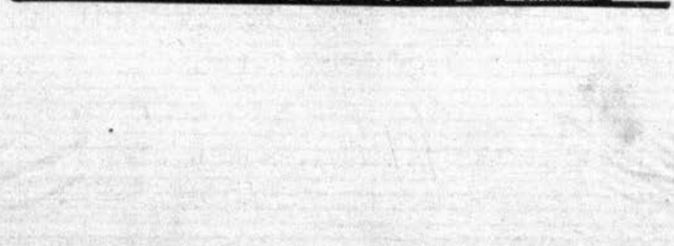
আজ শিয়ালদহ হইতে গাড়ীতে চড়িয়া লোকে সুদূর দার্জ্জিলিং, পূর্ণিয়া (বিহার), কামরূপ (আসাম) চলিয়া যাইতেছে। ২৪ পরগণা, খুলনা, ফরিদপুর যশোহর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, পাবনা, রাজশাহী, বগুড়া, দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি দার্জ্জিলিং, মালদহ, পূর্ণিয়া (বিহার) কুচবিহার, ময়মনসিংহ, ঢাকা, গোয়ালপাড়া, (আসাম) ও দরং (আসাম) এই একুশটি বিভিন্ন জেলার ভিতব দিয়া ঈ, বি, রেলওয়ে চলিতেছে। কলিকাতা অঞ্চল হইতে বরিশাল, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ত্রিপুরা এবং আসামের শ্রীহট্ট ও গারো পাহাড় যাইতেও ঈ বি রেল পথ ব্যবহার করিতে হয়।

কিছুদিন পূর্ব্বেও কলিকাতা হইতে মাত্র সান্তাহার পর্যান্ত বড় লাইন (Broad Gauge) ছিল। দার্জ্জিলিং, আমিনগাঁ, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানে যাইতে এখান হইতে মাঝারি লাইনের (Metre Gauge) গাড়ীতে বদল করিতে হইত। এখন শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত বড় লাইন গিয়াছে। দার্জ্জিলিং যাইতে এখান হইতে পাহাড়ে চড়িবার জন্য দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের ছোট গাড়ীতে চড়িতে হয়। দিনাজপুর এবং রংপুর যাইতেও পার্ব্বতীপুরে গাড়ী বদল করিতে হয়।

বর্ত্তমানেও ঈ বি রেলের প্রসার কার্য্যের বিরাম নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে দিনাজপুর হইতে রুহিয়া পর্য্যন্ত একটি লাইন খোলা হইয়াছে। সম্প্রতি বারুইপুর-লক্ষ্মীকান্তপুর শাখা লাইন, পূর্ণিয়া মুরলীগঞ্জ লাইন, আবদুলপুর-নবাবগঞ্জ, কালুখালি-ভাটিয়াপাড়া ও টাঙ্গলা-রঙ্গপাড়া শাখা লাইন খোলা হইয়াছে।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ঈ বি রেলওয়ে যখন মাত্র ১১১ মাইল পথ খুলিয়াছিলেন তখন কে জানিত ৭৫ বছরের মধ্যে সেই প্রতিষ্ঠানটি এত দ্রুত বিস্তারলাভ করিবে? আজ ঈ বি রেলওয়ে বাংলা, আসাম ও বিহার প্রদেশে কিঞ্চিদধিক ৩,০৭৮ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছে। ইহার মধ্যে বড় লাইন (Broad Gauge) ১,৭১৭ মাইল, মাঝারি লাইন (Metre Gauge) ১,৩৪৩ মাইল, আর ছোট লাইন (Narrow Gauge) ৪০ মাইল। সর্ব্বসমেত ৪৬১টি স্টেশনের মধ্য দিয়া এই লৌহবর্ত্ম প্রসারিত। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে এই লাইনে **চার কোটীর অধিক আরোহী যাতায়াত করিয়াছে।**

এই লাইনে সাধারণতঃ কৃষিজাত জিনিষই চালান গিয়া থাকে যথা:—পাট, ধান, চাউল, দাল, সরিষা চা, তামাক, ফল, সব্জী ও তরিতরকারী। রেল-কর্ত্তৃপক্ষ অনেক স্থলে এই সব জিনিষ চালানের জন্য অল্পহারে মাশুল ধার্য্য ও অন্যান্য সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। গুড়, রেশম, গুটিপোকা, মাছ, ডিম, শালকাঠ, জ্বালানী-কাঠ, দুধ, দধি ইত্যাদিও প্রচুর পরিমাণে এই রেলে চালান গিয়া থাকে।



পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথে বাংলা দেশ

(ক) কলিকাতা—শিলিগুড়ি।

রাণাঘাট-বনগ্রাম ও রাণাঘাট শান্তিপুর, পোড়াদহ-গোয়ালন্দ-ফরিদপুর -ভাটিয়াপাড়া ঘাট, ঈশ্বরদি-সিরাজগঞ্জঘাট ও আবদুলপুর -চাপাই-নবাবগঞ্জ শাখা

দমদম জংশন—কলিকাতা হইতে ৪ মাইল দূর। এই স্থানের চলিত নাম ঘুঘুডাঙ্গা। এখানে কলিকাতাবাসী বহু ধনী ব্যক্তির উদ্যান বাটিকা আছে। স্টেশন হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে বাগজলা নামক স্থানে একজন পীরের সমাধি আছে। তথায় প্রতি বৎসর মাঘ মাসে সপ্তাহব্যাপী একটি মেলা বসে।

দমদম জংশন হইতে খুলনা শাখা লাইন বাহির হইয়াছে। কলিকাতা হইতে খুলনা পর্য্যন্ত সরাসরি গাড়ী যাতায়াত করে।

বেলঘরিয়া—কলিকাতা হইতে ৭ মাইল দূর। স্টেশনের এক মাইল পূর্ব্বদিকে **নিমতা** গ্রাম কবি কৃষ্ণরামের জন্ম স্থান। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কৃষ্ণরাম দাসের জন্ম হয়। তিনি ব্যাঘ্রের দেবতা দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্য সূচক "রায় মঙ্গল" কাব্য লিখিয়া যশস্বী হন। "রায় মঙ্গল" ছাড়া কবি কৃষ্ণরাম "ষষ্ঠী মঙ্গল", "অশ্বমেধ পর্ব্ব" ও "কালিকা মঙ্গল" (বিদ্যাসুন্দর) কাব্য প্রণয়ন করেন। বাঙালী কবিগণের মধ্যে কবি কৃষ্ণরামই বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানের আদি কবি। কৃষ্ণরামের পর বিখ্যাত শ্যামাসঙ্গীত রচয়িতা রামপ্রসাদ সেন, মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ও প্রাণারাম চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক কবি "বিদ্যাসুন্দর" রচনা করেন। কবি কৃষ্ণরামের জন্মভিটা আজিও নিমতা গ্রামে বর্ত্তমান আছে।

আগড়পাড়া—কলিকাতা হইতে ৮½ মাইল দূর। স্টেশনের অতি নিকটে ডাউন প্লাটফরমের পার্শ্বে সুপ্রসিদ্ধ তারাপুকুরের পীরের আস্তানা অবস্থিত। এই আস্তানাটি বহু প্রাচীন। আনুমানিক তিন শত বৎসর পূর্ব্বে আজমীর হইতে একজন পীর আসিয়া এই স্থানে বটবৃক্ষমূলে বসিয়া তপস্যা করেন। তাঁহার অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া স্থানীয় অধিবাসিগণ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হন। কথিত আছে, একবার তিনি জনৈক ধনী শিষ্যের বন্ধুবর্গের ব্যবহারের জন্য ইচ্ছামাত্র বহু রৌপ্যনির্ম্মিত তৈজসপত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পীরের সমাধির উপর একটি একগম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছে। যে বটবৃক্ষতলে পীরের আসন ছিল, উহা শাখা প্রশাখা বিস্তার পূর্ব্বক একটি ছায়াশীতল কুঞ্জ রচনা করিয়া আজিও দণ্ডায়মান আছে। পীর সাহেবের মৃত্যু তিথি ১লা মাঘ তারিখ হইতে এখানে

সপ্তাহব্যাপী একটি বৃহৎ মেলা হয়। এই মেলায় প্রচুর পরিমাণে চাউল বিক্রয় হয়। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক এই পীরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

আগড়পাড়ার নিকটবর্ত্তী কামারহাটি একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এই গ্রামে কলিকাতা বহুবাজারনিবাসী প্রসিদ্ধ ধনী ৺সাগর দত্ত মহাশয়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সুন্দর উদ্যান মধ্যে অবস্থিত একটি প্রকাণ্ড হাসপাতাল ও একটি অবৈতনিক উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় আছে।



তারাপুকুরের দরগাহ্

সোদপুর—কলিকাতা হইতে ১০ মাইল দূর। স্টেশনের নিকটেই রুগ্ন ও বৃদ্ধ গবাদি পশুর চিকিৎসা ও পালনের জন্য "পিঁজরাপোল" অবস্থিত। এই প্রতিষ্ঠানটি কলিকাতা পিঁজরাপোল সমিতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। প্রতিবৎসর গোপাষ্টমী তিথিতে এখানে একটি বিরাট মেলা হয়। সোদপুরে একটি কাপড়ের কল আছে। খাদি প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র এখানে অবস্থিত।

সোদপুর স্টেশন হইতে এক মাইল পশ্চিমে গঙ্গাতীরে **পানিহাটি** গ্রাম। প্রায় চার শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত জয়ানন্দের "চৈতন্য মঙ্গল" গ্রন্থে আছে,

"পানিহাটি সম গ্রাম নাহি গঙ্গাতীরে।
বড় বড় সমাজ সব পতাকা মন্দিরে ॥"

পানিহাটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিকট একটি পবিত্র স্থান। শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ রাঘব পণ্ডিতের শ্রীপাট এই গ্রামে অবস্থিত। এই শ্রীপাটে অতি প্রাচীন মাধবী লতাকুঞ্জের মধ্যে রাঘব পণ্ডিতের সমাধি আছে। রাঘব পণ্ডিতের সেবিত মদন-মোহন বিগ্রহ এখানে নিত্য পূজিত হন। রাঘব মন্দিরে শ্রীচৈতন্যদেবের নিত্য আবির্ভাব হয় বলিয়া চৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

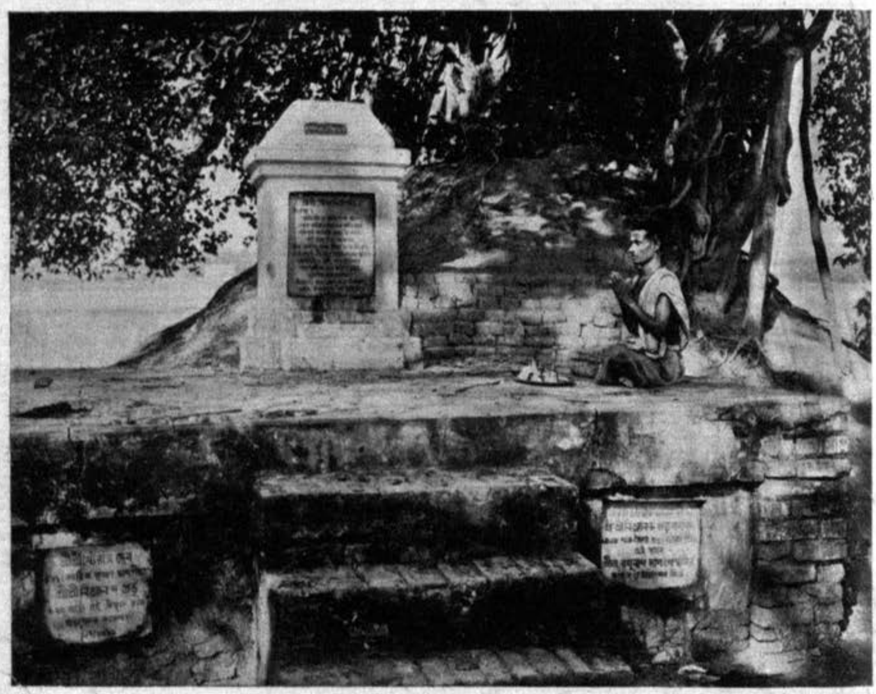


রাঘব পণ্ডিতের সমাধি, পানিহাটি

পানিহাটিতে গঙ্গাতীরে প্রায় সাত শত বৎসরের পুরাতন বলিয়া কথিত একটি প্রাচীন বটবৃক্ষ আছে। শ্রীচৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ পানিহাটিতে আসিয়া এই বটবৃক্ষ মূলে উপবেশন করিয়াছিলেন। বটবৃক্ষতলস্থ বেদীর একটি প্রস্তরফলকে এই কথা লিখিত আছে। বটবৃক্ষের পার্শ্বে একটি অতি প্রাচীন ঘাটের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই ঘাটে একটি প্রস্তরফলকে লিখিত আছে যে ইহা হিন্দু আমলে নির্ম্মিত এবং ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে পুরী হইতে প্রত্যাগমন কালে শ্রীচৈতন্যদেব এই ঘাটে নৌকা হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন। এখনও প্রতি বৎসর চৈতন্যদেবের আগমন স্মরণ উপলক্ষে কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথির পরবর্ত্তী রবিবারে এখানে মহোৎসব ও মেলা হয়। সপ্তগ্রামের রাজপুত্র রঘুনাথ দাস গোস্বামী পানিহাটির বটবৃক্ষমূলে নিত্যানন্দের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এবং এই স্থানেই তিনি গণসহ নিত্যানন্দকে চিঁড়া-দধি ভোজন করাইয়াছিলেন। এই

ভোজনোৎসব "দণ্ড মহোৎসব" নামে পরিচিত। আজিও জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে দেশ বিদেশ হইতে বৈষ্ণবগণ এই বটবৃক্ষমূলে সম্মিলিত হইয়া এই মহোৎসবের অনুষ্ঠান করেন। বটবৃক্ষের নিকটে একটি ক্ষুদ্র গৃহে শ্রীচৈতন্যদেবের চরণচিহ্ন রক্ষিত আছে।

পানিহাটিতে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে বহুদিন অবস্থান করিয়া নিত্যানন্দ গঙ্গাতীরবর্ত্তী গ্রাম সমূহে প্রেম ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন।



প্রাচীন বটবৃক্ষ, পানিহাটি

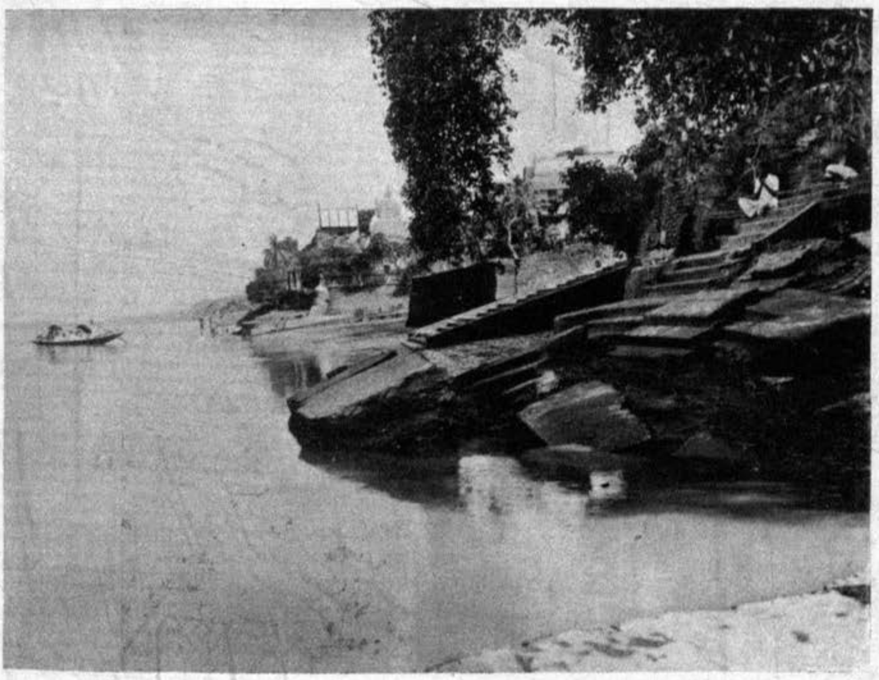
পানিহাটি গ্রামের মধ্যে একটি ছায়া শীতল বট বৃক্ষের মূলে বৃন্দাবনের চৌষট্টি মহান্তের সমাজের অনুকরণে নির্ম্মিত একটি স্মৃতি সমাধি মন্দির আছে। উহাতে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রভৃতি মহাপুরুষ ও ভক্তগণের স্মৃতিমঞ্চ ও প্রস্তর ফলক আছে।

পানিহাটির শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দিরে বহু বৈষ্ণব ভক্তের স্মৃতিচিহ্ন সযত্নে রক্ষিত আছে।

কলিকাতার মহানির্ব্বাণ মঠের প্রতিষ্ঠাতা প্রসিদ্ধ অবধূত জ্ঞানানন্দ স্বামী পানিহাটিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মভিটার উপর নির্ম্মিত "কৈবল্য মঠ" পানিহাটির অন্যতম দ্রষ্টব্য।

পানিহাটির প্রাচীন ঘাটের ও রাঘব ভবনের দুইখানি ইষ্টক আমেরিকার ফ্লোরিডা শহরে উইন্‌টার পার্কে "Walk of Fame" নামক প্রতিষ্ঠানে আমেরিকাবাসিগণ কর্ত্তৃক সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

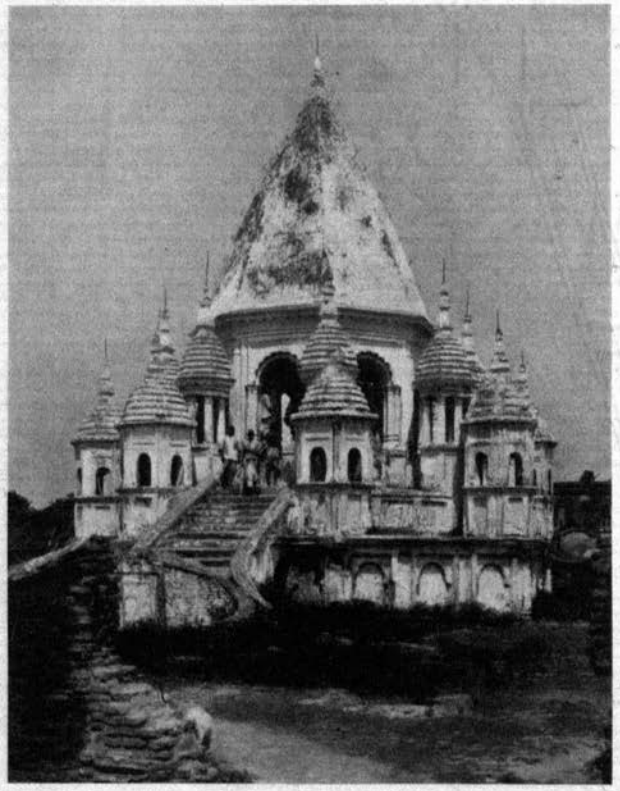
খড়দহ—কলিকাতা হইতে ১২ মাইল দূর। ইহাও বৈষ্ণবদিগের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশে নিত্যানন্দ সন্ন্যাস আশ্রম ছাড়িয়া গার্হস্থ্যধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং নবদ্বীপের নিকটস্থ শালিগ্রামের পণ্ডিত সূর্য্যদাস সরখেলের বসুধা ও জাহ্নবী নাম্নী দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। কথিত আছে সস্ত্রীক নিত্যানন্দ খড়দহে আসিয়া তত্রত্য ভূস্বামীর নিকট বাসস্থানের জন্য একখণ্ড ভূমি প্রার্থনা করায় তিনি বিদ্রূপচ্ছলে গঙ্গায় একটি খড় ফেলিয়া বলিলেন যে উহাই তাঁহার বাসস্থান। নিত্যানন্দের প্রভাবে



প্রাচীন ঘাট, পানিহাটি

সেই প্রবল দহের মধ্যে একটি চর উত্থিত হইল এবং তিনি সেই স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই জন্য স্থানের নাম হইল খড়দহ। নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী খড়দহে শ্যামসুন্দর বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিগ্রহ সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবাদ আছে। গঙ্গার পশ্চিমতীরবর্ত্তী বল্লভপুর গ্রামে রুদ্র ব্রহ্মচারী নামক একজন ভক্ত বাস করিতেন। তিনি একদিন স্বপ্নে দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁহাকে গৌড়ের বাদশাহের প্রাসাদ হইতে একখানি প্রস্তর আনিয়া উহা হইতে বিগ্রহ নির্ম্মাণের আদেশ

দিতেছেন। রুদ্র গৌড়ে উপস্থিত হইয়া স্বপ্ন নির্দ্দিষ্ট পাথর খানি বাদশাহের নিকট প্রার্থনা করেন। বাদশাহ প্রথমে উহা দিতে সম্মত হন নাই। কিন্তু হঠাৎ পাথর খানি হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইতে থাকে। বাদশাহের জনৈক হিন্দু মন্ত্রী বাদশাহকে বুঝাইয়া দেন যে ইহা বিশেষ অশুভ লক্ষণ। সুতরাং অবশেষে পাথরখানি রুদ্রকে দান করা হয়। পাথরখানি এত ভারী যে নৌকায় তুলিবার সময় উহা জলে পড়িয়া যায়, কিন্তু দৈব প্রভাবে উহা গঙ্গার স্রোতে আনীত হইয়া বল্লভপুরের ঘাটে লাগে। এই পাথর খানি হইতে রুদ্র শ্যামসুন্দর,



শ্যামসুন্দরের রাসমঞ্চ, খড়দহ

রাধাবল্লভ ও নন্দদুলাল নামক তিনটি সুন্দর বিগ্রহ তৈয়ারী করাইয়াছিলেন। এই বিগ্রহ তিনটির মধ্যে শ্যামসুন্দর বিগ্রহের উপর বীরভদ্র গোস্বামীর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। প্রথমে রুদ্র তাঁহাকে এই বিগ্রহটি দান করিতে সম্মত হন নাই। অতঃপর একদিন রুদ্র স্বীয় ভবনে পিতৃশ্রাদ্ধ করিতেছেন এমন সময়ে ভীষণ মেঘ হইয়া শ্রাদ্ধ পণ্ড করিবার উপক্রম হইল। নিমন্ত্রিত হইয়া বীরভদ্রও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রুদ্রের বিপদ দেখিয়া তিনি স্বীয় অলৌকিক শক্তি প্রভাবে প্রবল বারি বর্ষণ হইতে শ্রাদ্ধমণ্ডপ রক্ষা

করিলেন। ইহাতে প্রীত হইয়া রুদ্র বীরভদ্রকে শ্যামসুন্দর বিগ্রহ দান করিলেন। খড়দহের শ্যামসুন্দর মন্দির ও গঙ্গাতীরবর্ত্তী রাসমঞ্চ এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য। রাসযাত্রা, দোল পূর্ণিমা ও মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষে খড়দহে বিশেষ সমারোহ ও মেলা হয়।

খড়দহের গঙ্গাতীরে পুরাতন বাংলা রীতিতে নির্ম্মিত চব্বিশটি শিবমন্দির আছে। খড়দহ নিবাসী ধর্ম্মপ্রাণ জমিদার ৺প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস এই মন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠাতা। কথিত আছে, বহু অর্থ ব্যয়ে বিশ্বাস মহাশয় স্বীয় ভবনে লক্ষ শালগ্রাম শিলা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। রামতোষণ বিদ্যারত্ন নামক জনৈক পণ্ডিতের সহায়তায় বিশ্বাস মহাশয় "প্রাণতোষিণী মহাতন্ত্র" নামে একখানি তন্ত্র-সংগ্রহ গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

রুদ্রব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত নন্দদুলাল বিগ্রহ খড়দহ হইতে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত **সাঁইবনা** নামক গ্রামে প্রতিষ্ঠিত আছেন। মাঘী পূর্ণিমার সময় সাঁইবনায় একটি বৃহৎ মেলা হয় ও সেই সময় খড়দহ হইতে এই স্থান পর্য্যন্ত মোটরবাস যাতায়াত করে। মাঘী পূর্ণিমার দিন গঙ্গার পশ্চিম পারস্থ বল্লভপুরের রাধাবল্লভ, খড়দহের শ্যামসুন্দর ও সাঁইবনার নন্দদুলাল এই তিন বিগ্রহ দর্শন করা মহিলাগণের নিকট বিশেষ পুণ্যের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

টিটাগড়—কলিকাতা হইতে ১২ মাইল দূর। বহু পাটকল ও কাগজের কলের জন্য এই স্থান বিখ্যাত।

স্টেশন হইতে প্রায় দেড় মাইল পশ্চিমে গঙ্গাতীরে বিশালাক্ষীর মন্দির অবস্থিত। মন্দিরটি আধুনিক হইলেও এই দেবী অতি পুরাতন। দেবী ত্রিনেত্রা, পীতবর্ণা ও চতুর্ভুজা। মন্দিরের নিকটেই গঙ্গাগর্ভে "বিশালক্ষীর দহ" নামে একটি অতি গভীর দহ আছে। স্থানীয় জনসাধারণের বিশ্বাস দেবীর পূজা না দিয়া নৌকা ছাড়িলে দেবী এই দহ মধ্যে নৌকা ডুবাইয়া দেন। বৈশাখমাসে দেবীকে গঙ্গাজলে স্নান করাইবার জন্য এখানে বহু নরনারীর সমাগম হয়।

টিটাগড়ে রাণী রাসমণির কন্যা তারা ঠাকুরাণী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঘাট, চাঁদনী, দ্বাদশ শিবমন্দির ও অন্নপূর্ণার মন্দির আছে। এখানে মহাষ্টমী ও অন্নপূর্ণা পূজার সময় বিশেষ সমারোহ হয়।

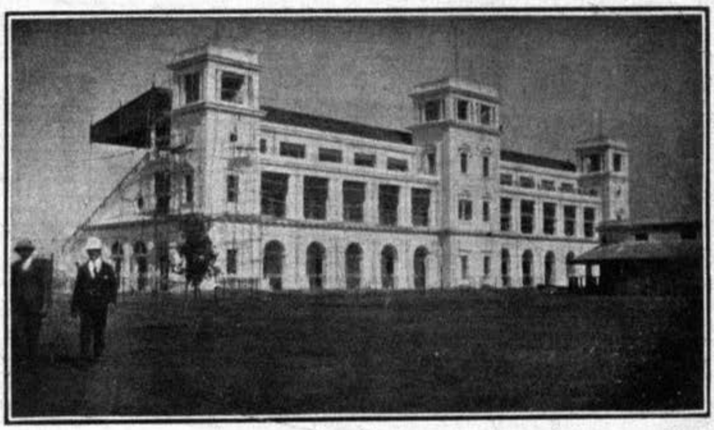
ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে টিটাগড়ে একটি ডক্ এবং প্রায় তিন শত বিঘা জমি লইয়া একটি উদ্যান ছিল। বর্ত্তমানে উহাদের কোন চিহ্ন নাই।

বারাকপুর—কলিকাতা হইতে ১৪ মাইল দূর। ইহা ২৪ পরগণা জেলার একটি মহকুমা। দমদমের সেনা নিবাস উঠিয়া যাওয়ায় ইহা এখন কলিকাতার নিকটবর্ত্তী একমাত্র সেনা নিবাস। এই সেনা নিবাস ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮২৪ ও ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এখানকার দেশীয় সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়াছিল। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মযুদ্ধের সময় একদল ভারতীয় সিপাহীকে স্থলপথে চট্টগ্রাম ও আরাকানের দিকে

প্রেরণ করা হয়। এই সময়ে গুজব রটে যে ব্রহ্মযুদ্ধে যোগদানের জন্য সিপাহীগণকে জাহাজে করিয়া কালাপানি (বঙ্গোপসাগর) পার করা হইবে। সিপাহীগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের বহু হিন্দু ছিল। এই সংবাদ বারাকপুরে রাষ্ট্র হইবামাত্র তথাকার সিপাহীরা সমুদ্র পার হইলে জাতি যাইবে, এই আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া উঠে এবং ৩০এ অক্টোবর রাত্রে প্রকাশ্য ভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বন্দুক ও কামানের গুলিতে ইহাদের মধ্যে অনেকে প্রাণত্যাগ করে এবং বিদ্রোহের নায়কগণকে ফাঁসি দেওয়া হয়। এই বিদ্রোহ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের ন্যায় ভারতব্যাপী অশান্তির সৃষ্টি করে নাই। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিখ্যাত সিপাহী বিদ্রোহও সর্ব্ব প্রথম বারাকপুরে আত্মপ্রকাশ করে। সেই সময়ে এখানে চারিটি ভারতীয় রেজিমেণ্ট বা সেনাবাহিনী ছিল। একদিন বারুদখানার একজন নিম্ন জাতীয় খালাসী জনৈক উচ্চবর্ণের সিপাহীর লোটা হইতে জল পান করিতে চাহিলে সে আপত্তি করিয়া বলে যে, নীচ জাতির সংস্পর্শে তাহার লোটা অপবিত্র হইয়া যাইবে। ইহাতে খালাসীটি তাহাকে বলে যে কলিকাতার কেল্লায় যে নূতন রকমের টোটা প্রস্তুত হইতেছে তাহাতে গরু ও শূকরের চর্ব্বি মিশ্রিত আছে। উহা প্রত্যেক সিপাহীকে দাঁত দিয়া কাটিয়া বন্দুকে পুরিতে হইবে, সুতরাং সিপাহীদের জাতির গুমোর আর বেশীদিন থাকিবে না। এই সংবাদ সিপাহী মহলে প্রকাশ পাইলে তাহাদের মধ্যে দারুণ অসন্তোষ ও চাঞ্চল্য দেখা দেয়। ইংরেজ সেনাপতি বহু যুক্তি তর্কের দ্বারাও তাহাদের বিশ্বাস টলাইতে পারেন নাই। মঙ্গল পাণ্ডে নামক একজন সিপাহী অন্যান্য সিপাহীগণকে জীবনপণ করিয়া জাতি ও ধর্ম্ম রক্ষার জন্য উত্তেজিত করিতে থাকে। সশস্ত্র মঙ্গল পাণ্ডেকে দমন করিতে গিয়া জনৈক সেনানায়ক ও একজন সার্জ্জেণ্ট মেজর উভয়েই তাহার হস্তে নিহত হন। অবশেষে বহু সশস্ত্র সৈনিকের সহায়তায় মঙ্গল পাণ্ডে ধৃত হইলে সামরিক আদালতের বিচারে তাহার প্রাণদণ্ড হয়। বারাকপুর হইতে বিদ্রোহ ভারতের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়ে এবং তাহার ফলে দারুণ অশান্তির উদ্ভব হয়। এই বিদ্রোহ দমন করিতে ভারত সরকারকে যথেষ্ট কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।

বারাকপুরের প্রাচীন নাম চাণক। অনেকে মনে করেন যে কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব্ চার্ণকের নাম হইতে বারাকপুরের নাম চাণক হইয়াছে। কিন্তু এই ধারণা অমূলক। কারণ ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত ব্রুকের মানচিত্রে কাঁকিনাড়া ও বরাহনগরের মধ্যে চাণক নামক ক্ষুদ্র গ্রামের উল্লেখ আছে। চাণকে ভাগিরথীতীরে একটি প্রকাণ্ড উদ্যান ও তাহার ভিতরে ভারতবর্ষের বড়লাটদিগের একটি প্রাসাদ আছে। ১৮০১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই প্রাসাদে ইংরেজ ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রধান সেনানায়ক বাস করিতেন। কিন্তু উক্ত বৎসরে গভরর্ণর-জেনারল লর্ড্ ওয়েলেস্‌লি প্রধান সেনানায়ক হওয়া অবধি ইহা গভর্ণর-জেনারল্‌গণের বাসস্থান হইয়াছে। কলিকাতার কর্ম্মকঠোর শ্রমের পর নিকটস্থ পল্লীতে বিশ্রামের উপযোগী স্থান খুঁজিবার সময় লর্ড ওয়েলেস্‌লি এই উদ্যানটিই পছন্দ করেন; ইহার সহিত সত্যকার ইংরেজী পার্কের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গভরর্ণর-জেনারলেরা বিশ্রাম করিতে বারাকপুরে যাইতেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ের গভর্ণর-জেনারল্ লর্ড ক্যানিংএর পত্নী বারাকপুর প্রাসাদ অত্যন্ত ভালবাসিতেন বলিয়া দার্জ্জিলিং হইতে ফিরিবার পথে তাঁহার মৃত্যু হইলে বারাকপুর উদ্যানে তাঁহার মৃতদেহ

সমাহিত করা হইয়াছিল। গঙ্গাতীরে তাঁহার উচ্চ সমাধি-মন্দির বহুদূর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। লেডি ক্যানিংএর নাম হইতে বাঙালীর সুপ্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন লেডিকেনীর নাম হইয়াছে। এখনও ভারতবর্ষের গভর্ণর-জেনারল্ কালিকাতায় আসিলে বারাকপুর প্রাসাদে কয়েকদিন কাটাইয়া থাকেন। বারাকপুরের অন্তর্গত মণিরামপুর পল্লীতে প্রসিদ্ধ জননায়ক বাগ্মী-প্রবর স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসভূমি এবং এই স্থানেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। এখানে একটি ঘোড়দৌড়ের ময়দান আছে।



ঘোড়দৌড়ের মাঠ, বারাকপুর

পল্‌তা—কলিকাতা হইতে ১৫½ মাইল। স্টেশনের নিকটে ভাগীরথীকূলে কলিকাতার জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের বিরাট কারখানা এখানে অবস্থিত। ইহা একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য।

ইছাপুর—কলিকাতা হইতে ১৭ মাইল দূর। এখানে অর্ডন্যান্স্ ফ্যাক্টরী বা সরকারী অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুতের কারখানা অবস্থিত। প্রথমে ওলন্দাজগণ এই কারখানা বাটীর মালিক ছিলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে এখানে ইংরেজ সরকারের কারখানা স্থাপিত হয় এবং ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে এখানে সর্ব্বপ্রথম রাইফেল প্রস্তুত হয়। সম্প্রতি স্টেশনের নিকটে শিখদিগের একটি গুরুদ্বার নির্ম্মিত হইয়াছে।

ইছাপুর স্টেশন হইতে দেড় মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে গঙ্গাতীরবর্ত্তী নবাবগঞ্জ গ্রামে রাসের সময় পক্ষকালস্থায়ী একটি বৃহৎ মেলা হয়।

শ্যামনগর—কলিকাতা হইতে ১৯ মাইল দূর। স্টেশনের অতি নিকটে মূলাযোড়ের প্রসিদ্ধ কালীবাড়ী ও দ্বাদশ শিব মন্দির অবস্থিত। কলিকাতা পাথুরিয়া-ঘাটার গোপীমোহন ঠাকুর কর্ত্তৃক এই কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠিত হয়। কথিত আছে, গোপী-মোহনের সাত বৎসর বয়স্কা কন্যা ব্রহ্মময়ীর মৃত্যু হইলে তাহার শব গঙ্গার স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে মূলাযোড়ের ঘাটে গিয়া লাগে। সেই রাত্রেই গোপীমোহন স্বপ্নে

দেখেন যে কালী যেন তাঁহাকে মূলাযোড়ে মন্দির নির্ম্মাণ ও ব্রহ্মময়ী নামে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে আদেশ করিতেছেন। একটি সুন্দর উদ্যান মধ্যে ব্রহ্মময়ীর মন্দির অবস্থিত। এখানে আনন্দশঙ্কর, গোপীশঙ্কর ও হরশঙ্কর নামে তিনটি বৃহৎ শিবলিঙ্গ আছে। ব্রহ্মময়ীর মন্দিরের পিছনদিকে একটি স্বতন্ত্র মন্দিরে গোপীনাথ জীউ নামক পাষাণ নির্ম্মিত সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ অবস্থিত। কালীবাড়ীতে প্রতি মাসের অমাবস্যা, রটন্তী চতুর্দ্দশী এবং কালীপূজার সময় বিশেষ সমারোহ হয় এবং সমগ্র পৌষ মাস ধরিয়া এখানে একটি মেলা বসে।

মূলাযোড়ে একটি সংস্কৃত কলেজ, অতিথিশালা ও দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। এই গুলিও গোপীমোহন ঠাকুরের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

সুপ্রসিদ্ধ "অন্নদামঙ্গল" প্রণেতা মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট হইতে ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হইয়া মূলাযোড়ে বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শেষ জীবন এই স্থানেই অতিবাহিত হয়।

মূলাযোড়ের নিকটবর্ত্তী কাউগাছি গ্রামে একটি প্রাচীন গড়ের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, পশ্চিম বঙ্গে মহারাষ্ট্রীয় বর্গীর উপদ্রবের সময় বর্দ্ধমানের তৎকালীন নাবালক মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের জননী এই স্থানে একটি গড় পরিবেষ্টিত প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন এবং বিপদের সময় এখানে আসিয়া বাস করিতেন। আবার কাহারও মতে ইহা একটি পুরাতন নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ।

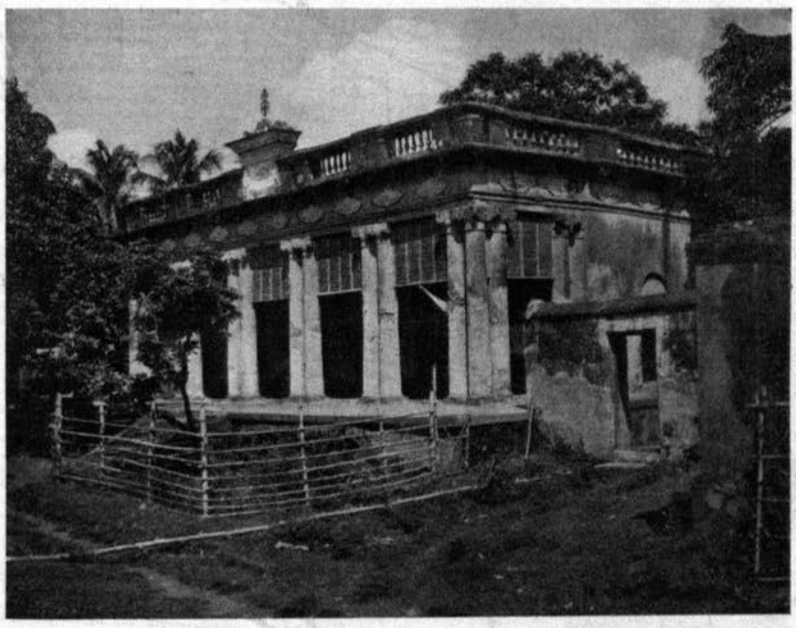
শ্যামনগরের নিকটবর্ত্তী রহুতা গ্রাম পরলোকগত সুসাহিত্যিক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্মস্থান। রঙ্গলাল প্রসিদ্ধ "বিশ্বকোষ" অভিধানের প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক। পরে কলিকাতার প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় বিশ্বকোষের সম্পাদনার ভার লইয়া এই বিরাট কোষ গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। ত্রৈলোক্যনাথের কয়েকখানি উপন্যাস বাঙ্গালী পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করিয়াছিল।

কাঁকিনাড়া—কলিকাতা হইতে ২২ মাইল দূর। এখানে অনেক গুলি কল হইয়াছে বলিয়া স্টেশনের নাম কাঁকিনাড়া, কিন্তু **ভাটপাড়াই** এ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ স্থান। ভাটপাড়া বা ভট্টপল্লী অতি পুরাতন গ্রাম। এখানে দুই শত বৎসরেরও অধিক পুরাতন অন্যূন ২০টি মন্দির দৃষ্ট হয়। ভাটপাড়া বাংলা দেশে সংস্কৃত চর্চ্চার একটি প্রধান কেন্দ্র। ইহা নানা শাস্ত্র-অধ্যাপক বহু পণ্ডিতের জন্মস্থান। ইহাদের মধ্য নিমাই তর্কপঞ্চানন, হলধর তর্কচূড়ামণি, তারাচরণ তর্করত্ন, রাখালদাস ন্যায়রত্ন, যদুরাম সার্ব্বভৌম, শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম, প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ভাটপাড়ার পণ্ডিত মণ্ডলীর শাস্ত্রীয় মতামত সমগ্র বঙ্গে সম্মানিত।

ভাটপাড়ার নিকটে জগদ্দলে দুইটি শুষ্কপ্রায় পরিখা দৃষ্ট হয়। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে মোগল বাহিনীর অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য যশোহর রাজ প্রতাপাদিত্য এখানে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে জগদ্দলে ও নিকটবর্ত্তী আটপুরে এবং খাস ভাটপাড়ায় অনেক গুলি পাটকল হইয়াছে।

ভাটপাড়া হইতে দুই মাইল পূর্ব্বে মাদরাল গ্রামে জয়চণ্ডী দেবীর একটি প্রাচীন মন্দির আছে। এখানে সপ্তম দোল উপলক্ষে মেলা ও বহু জন সমাগম হয়। জয়চণ্ডীর মূর্ত্তি এক খানি প্রস্তর হইতে খোদাই করিয়া নির্ম্মিত।

নৈহাটি জংশন—কলিকাতা হইতে ২৪ মাইল দূর। ভাটপাড়ার ন্যায় নৈহাটিতেও অনেকগুলি কল হইয়াছে এবং জনসংখ্যা বহুপরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ভাটপাড়ার ন্যায় নৈহাটিও অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের জন্মস্থান। নৈহাটি স্টেশনের ঠিক পূর্ব্বদিকবর্ত্তী **কাঁঠালপাড়া** পল্লী সাহিত্য-সম্রাট



বঙ্কিম ভবন, কাঁঠালপাড়া

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থান। এই স্থানকে বাংলার সাহিত্যিক-তীর্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের পৈতৃক নিবাসের অধিকাংশ জমি রেলওয়ে ইয়ার্ডের অন্তর্গত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার বৈঠকখানা ও পৈতৃক দেবালয়গুলি অভগ্ন আছে। যে কক্ষটিতে বসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থাদি রচনা করিতেন তাহা এখনও আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কুলদেবতা ৺বিজয় রাধাবল্লভ জীউর রথযাত্রা উপলক্ষে কাঁঠালপাড়ায় বিশেষ সমারোহ হয়। বঙ্কিম ভবনের অন্দরে একটি পুষ্করিণী আছে। অনেকে বলেন যে "চন্দ্রশেখর" উপন্যাসে বর্ণিত ভীমা পুষ্করিণীর বর্ণনা এই পুকুরটি হইতেই গৃহীত। বঙ্কিমচন্দ্রের পুণ্যস্মৃতি রক্ষা কল্পে প্রতিবৎসর কাঁঠালপাড়ায় সাহিত্যসেবীদিগের একটি সম্মেলন হইয়া থাকে; উহা "বঙ্কিম সাহিত্য সম্মেলন" নামে পরিচিত।

নৈহাটির উত্তরে অবস্থিত **গৌরিফা** গ্রাম প্রসিদ্ধ সমাজসংস্কারক, বাগ্মী, ভগবৎ-প্রেমিক ও সাহিত্যসেবী স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের জন্মস্থান। কেশবচন্দ্র একজন অসাধারণ মনীষা সম্পন্ন মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি ব্রাহ্ম সমাজে "নব বিধান" মতের প্রবর্ত্তক। বাংলার নব জাগরণের অন্যতম অগ্রদূত হিসাবে তাঁহার নাম চিরদিনই স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

নৈহাটি একটি জংশন স্টেশন। ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে পূর্ব্বভারত রেলপথের একটি ছোট শাখা হুগলীর নিকট "জুবিলী ব্রিজ" নামক ঝুলানো সেতুর উপর দিয়া গঙ্গা পার হইয়া এই স্থানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

হালিশহর—কলিকাতা হইতে ২৬ মাইল দূর। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কবিকঙ্কণ প্রণীত চণ্ডীকাব্যে হালিশহরের নামোল্লেখ আছে। এই স্থান কুমারহট্ট পরগনার অন্তর্গত এবং প্রাচীন কালে ইহা কুমারহট্ট নামে পরিচিত ছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরী হালিশহর বা কুমারহট্টের অধিবাসী ছিলেন। যে স্থানে তাঁহার বাসভবন ছিল, বর্ত্তমানে উহা "চৈতন্য ডোবা" নামে পরিচিত, এখানে একটি অতি পুরাতন পুষ্করিণী ও তাহার চতুর্দ্দিকে গৃহাদির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। সম্প্রতি ঈশ্বরপুরীর জন্মভিটায় ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত গৌর নিতাই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে এবং একটি মঠের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়া সম্ভবতঃ অর্থাভাবে অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া আছে। শ্রীচৈতন্যদেব গুরুর জন্মভিটা দর্শন করিবার জন্য কুমারহট্টে আগমন করিয়াছিলেন এবং গুরুর প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ এই স্থানের ধূলিমুষ্টি উত্তরীয়ের অঞ্চলে বাঁধিয়া লইয়াছিলেন। ঈশ্বর পুরীর অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য ও ভগবদ্ভক্তি অতি উজ্জ্বল অক্ষরে বৈষ্ণব সাহিত্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিত কুমারহট্টে একটি বাটী নির্ম্মাণ করিয়া মধ্যে মধ্যে তথায় বাস করিতেন। নবদ্বীপে ইহারই বাটীতে শ্রীচৈতন্য-দেবের কীর্ত্তন মহোৎসব হইত।

কুমারহট্টের বাসুদেব ঘোষ চৈতন্যদেব বিষয়ক পদাবলী রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইনি এবং ইহার দুই ভ্রাতা মাধব ও গোবিন্দানন্দ চৈতন্যদেবের ভক্ত অনুচর এবং বিখ্যাত কীর্ত্তনিয়া ছিলেন। শেষ বয়সে ইহারা নবদ্বীপবাসী হন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে হালিশহরে বিখ্যাত সঙ্গীত রচয়িতা শাক্ত সাধক রামপ্রসাদ সেন জন্ম গ্রহণ করেন। জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য রামপ্রসাদ কলিকাতার জনৈক ধনী ব্যক্তির সেরেস্তায় মুহুরির কার্য্য গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার মন সর্ব্বদাই কালী বিষয়ক চিন্তায় এতদূর মগ্ন থাকিত যে অনেক সময়ে অন্যমনস্ক হইয়া তিনি হিসাবের খাতার উপর স্বরচিত শ্যামা বিষয়ক সঙ্গীত লিখিয়া ফেলিতেন। এইরূপ একটি সঙ্গীতের কয়েকটি কলি একদিন তাঁহার মনিবের দৃষ্টিগোচর হওয়ায় তিনি বুঝিতে পারিলেন যে রামপ্রসাদ অতি উচ্চ স্তরের ভাবুক ও স্বভাব-কবি। গুণগ্রাহী মনিব রামপ্রসাদকে মুহুরির কার্য্য হইতে অব্যাহতি দিয়া তাঁহার মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অর্থ চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া রামপ্রসাদ শ্যামা সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং কথিত আছে যে তিনি

তাহাতে সিদ্ধিলাভও করেন। হালিশহরে তাঁহার পঞ্চবটী ও সাধন বেদী আজিও বর্ত্তমান আছে। সম্প্রতি রামপ্রসাদের স্মৃতিরক্ষা কল্পে এখানে একটি স্মৃতি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। কালী পূজার সময় এখানে বিশেষ ধুমধাম হয় এবং "প্রসাদ মেলা" নামে একটি মেলা বসে। রামপ্রসাদের শ্যামাবিষয়ক গান গুলি খুবই বিখ্যাত এবং যে বিশেষ সুরে উহা গীত হয় তাহা "রামপ্রসাদী সুর" নামে পরিচিত। শ্যামা সঙ্গীত ছাড়া রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দরের পালা অবলম্বনে একখানি কাব্য রচনা করেন এবং কৃষ্ণনগরের গুণগ্রাহী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট হইতে "কবিরঞ্জন" উপাধি প্রাপ্ত হন। রামপ্রসাদের সমসাময়িককালে হালিশহরে অযোধ্যারাম গোস্বামী বা আজু গোঁসাই নামে জনৈক বৈষ্ণব ভক্ত বাস করিতেন। ইনিও উপস্থিতমত সঙ্গীত রচনা করিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। রামপ্রসাদ কোন গান রচনা করিলে ইনি তাহার উত্তর স্বরূপ অপর একটি গান রচনা করিতেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র অনেক সময়ে এই দুই সঙ্গীত-নিপুণ কবিকে একত্র করিয়া

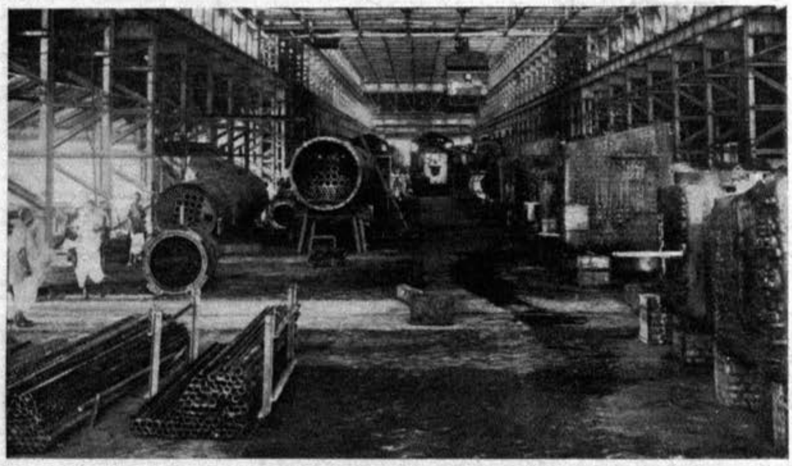


রামপ্রসাদের পঞ্চবটী, হালিশহর

উভয়ের সঙ্গীত-যুদ্ধ উপভোগ করিতেন। রামপ্রসাদের সাধনা-শক্তি সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে একবার স্বয়ং ভগবতী কন্যার রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার বেড়া বাঁধিবার দড়ি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। একদিন আজু গোঁসাই গঙ্গাস্নানান্তে কমণ্ডলুতে করিয়া গঙ্গাজল লইয়া ফিরিতেছেন, এমন সময়ে পথে রামপ্রসাদ তাঁহাকে ছুঁইয়া ফেলেন। আজু গোঁসাই ইহাতে অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং বলেন যে সুরাপায়ী তান্ত্রিক সাধক রামপ্রসাদের স্পর্শে তাঁহার কমণ্ডলু মধ্যস্থ গঙ্গাজল অপবিত্র

হইয়া গিয়াছে। জল ফেলিয়া দিয়া তিনি পুনরায় স্নানান্তে গঙ্গাজল লইয়া গেলেন, কিন্তু বাটীতে গিয়া আহ্নিক করিবার সময় দেখিলেন যে কমণ্ডলুর জল মদ্যে পরিণত হইয়াছে। তখন রামপ্রসাদের প্রভাব বুঝিতে পারিয়া তিনি তাঁহার নিকট গিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। আরও প্রবাদ আছে যে নবাব সিরাজউদ্‌দৌলা একদিন নৌকার উপর হইতে রামপ্রসাদের মর্ম্মস্পর্শী গান শুনিয়া বিশেষ মুগ্ধ হন এবং তাঁহাকে স্বীয় বজরায় আনয়ন করিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া তাঁহার গীতি-সুধা পান করেন।

"কাশীখণ্ড" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে ভাস্কর্য্য শিল্পে সুদক্ষ হালিশহরবাসী নয়ন ভাস্করের উল্লেখ আছে।



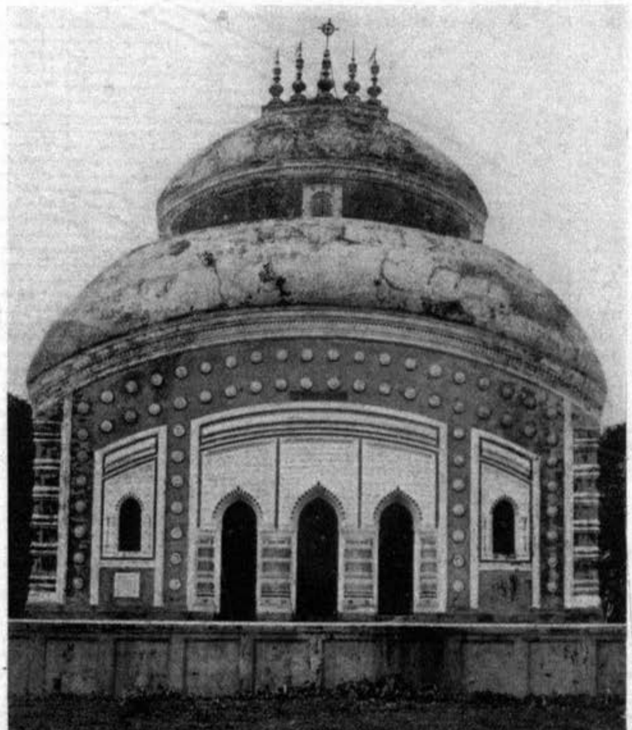
রেলের ওয়ার্কশপ, কাঁচড়াপাড়া

হালিশহরের আধুনিক দ্রষ্টব্যের মধ্যে স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত মঠ উল্লেখযোগ্য।

স্টেশন হইতে হালিশহর গ্রাম প্রায় দুই মাইল দূর। পরবর্ত্তী স্টেশন কাঁচড়াপাড়ায় নামিয়া ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়া হালিশহর যাওয়াই সুবিধা।

কাঁচড়াপাড়া—কলিকাতা হইতে ২৮ মাইল দূর। এই খানেই চব্বিশ পরগণা জেলার শেষ এবং ইহার পরেই নদীয়া জেলার আরম্ভ। এই স্থানে পূর্ব্ব-বঙ্গ রেলের ইঞ্জিন মেরামত ও গাড়ী তৈয়ারী করিবার কারখানা অবস্থিত। বড় মাপের লাইনের সমস্ত গাড়ীই এখানে প্রস্তুত হয়। যেখানে ওয়ার্কশপ্ অবস্থিত তাহার পুরাতন নাম বীজপুর। পূর্ব্বে বীজপুরে "ডাকাতে কালী" নামে এক কালী ছিলেন। কথিত আছে ডাকাতেরা এই কালীর নিকট নরবলি দিয়া ডাকাতি করিতে বাহির হইত। যে বৃক্ষমূলে এই কালীর মন্দির ছিল উহা এখনও বর্ত্তমান আছে। কাঁচড়াপাড়ার রেলওয়ে উপনিবেশ একটি সুদৃশ্য শহর। উদ্যান, ক্রীড়াক্ষেত্র, রাজপথ, বিদ্যুদালোক, কলের জল, বিদ্যালয়, ভজনাগার, প্রমোদগৃহ কোন কিছুরই এখানে অভাব নাই।

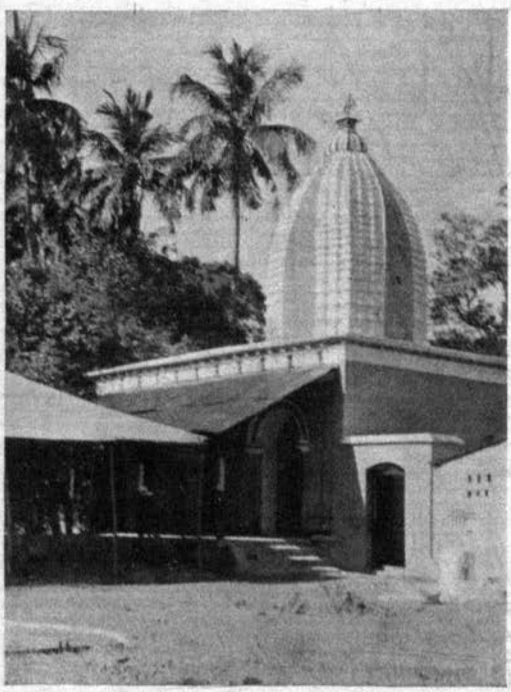
কাঁচড়াপাড়ার প্রাচীন নাম কাঞ্চনপল্লী। বৈষ্ণব সাহিত্যে এই স্থান "সেন শিবানন্দের পাট" নামে উল্লিখিত আছে। শিবানন্দ শ্রীচৈতন্যদেবের বিশেষ অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। চৈতন্যদেব কাঞ্চনপল্লীতে শিবানন্দের গৃহে আগমন করিয়াছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর চৈতন্যদেব যখন নীলাচলে (পুরীতে) অবস্থান করিতেন তখন প্রতিবৎসর রথযাত্রার সময় গৌড়দেশীয় ভক্তগণ তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেন। সেন শিবানন্দ এই ভক্তমণ্ডলীর পথ প্রদর্শক হইয়া তাঁহাদিগের সর্ব্বপ্রকার ব্যয়ভার বহন করিতেন। চৈতন্যদাস, রামদাস ও পুরীদাস নামে শিবানন্দের তিন পুত্র ছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ পুরীদাস বা পরমানন্দ সেন সংস্কৃত ভাষায় "চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক",



কৃষ্ণরায়ের মন্দির, কাঁচড়াপাড়া

"চৈতন্যচরিতামৃত কাব্য" ও "গৌরগণোদ্দেশদীপিকা" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া মহাকবিরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। স্বয়ং চৈতন্যদেব তাঁহাকে "কবিকর্ণপূর" উপাধি প্রদান করেন। বৈষ্ণবজগতে এই শেষোক্ত নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। সেন শিবানন্দের প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণরায় বিগ্রহ আজও কাঁচড়াপাড়ায় নিত্য পূজিত হইতেছেন।

যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত পুত্র রাঘব বা কচুরায় দিল্লী হইতে "যশোর-জিৎ" উপাধি ও বাদশাহী সনন্দলাভ করিবার পর কৃষ্ণরায়ের নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন ও নিত্য সেবা নির্ব্বাহের জন্য "কৃষ্ণবাটী" নামে একটি নিষ্কর তালুক জায়গীর দেন। এই মন্দির গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত হইবার পর কৃষ্ণরায়ের বর্ত্তমান মন্দির ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা নিবাসী নিমাইচরণ ও গৌরচরণ মল্লিক মহাশয়দ্বয়ের ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। এই মন্দিরের কারুকার্য্য অতি সুন্দর। রথের সময় কাঁচড়াপাড়ায় বিশেষ সমারোহ হয়।



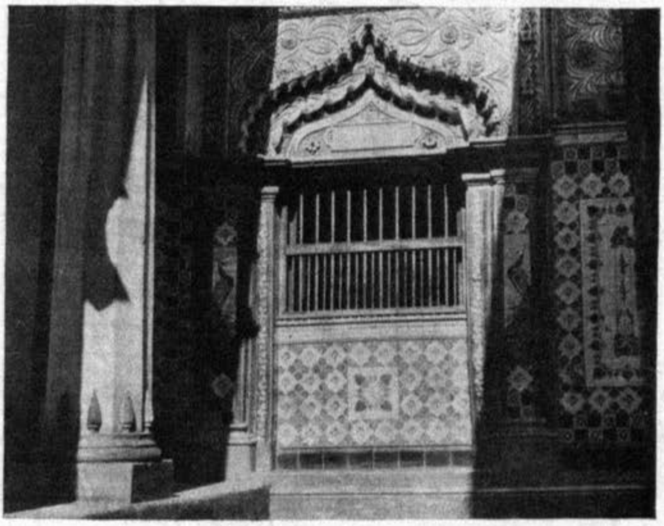
কুলিয়ারপাটের মন্দির

সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন সংবাদপত্র "প্রভাকর" সম্পাদক ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ মনীষিগণের সাহিত্যগুরু সুকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কাঁচড়াপাড়ার অধিবাসী ছিলেন। ইংরেজী প্রভাব বর্জ্জিত খাঁটি বাঙালীর ধরণে যাঁহারা কবিতা লিখিতেন ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহাদিগের সর্ব্বশেষ কবি। এই কবির জন্মস্থান হিসাবে কাঁচড়াপাড়া বঙ্গসাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই দ্রষ্টব্য স্থান। বিখ্যাত ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত নিমচাঁদ শিরোমণি ও তুলসীরামায়ণ ও অদ্ভুত রামায়ণের বঙ্গানুবাদক হরিমোহন গুপ্ত কাঁচড়াপাড়ার অধিবাসী ছিলেন।

কাঁচড়াপাড়ার নিকটবর্ত্তী সুবর্ণপুর গ্রাম সুপ্রসিদ্ধ "আর্য্য-দর্শন" সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জন্মস্থান। যোগেন্দ্রনাথের "গ্যারিবল্ডির জীবন চরিত", "ম্যাটসিনির জীবন চরিত" ও "জন স্টুয়ার্ট মিলের জীবন চরিত" প্রভৃতি বহু গ্রন্থ এক সময়ে

বঙ্গ সাহিত্যে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। বাংলার জাতীয় ভাব উদ্দীপনে যোগেন্দ্র-নাথের দান নিতান্ত সামান্য নহে।

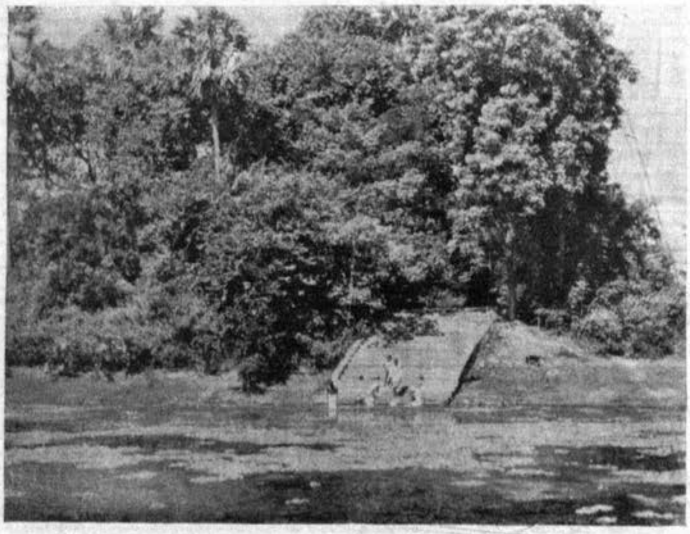
কাঁচড়াপাড়া স্টেশন হইতে প্রায় তিন মাইল উত্তর-পূর্ব্বে নদীয়া জেলায় "অপরাধভঞ্জন" বা **কুলিয়ারপাট** অবস্থিত। এখানে একটি সুন্দর মন্দিরে গৌর নিতাই বিগ্রহের নিত্য পূজা হয়। এখানকার দ্বাদশবকুল নামক কুঞ্জ বৈষ্ণবগণের নিকট অতি প্রিয়। প্রতিবৎসর অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে এখানে তিন দিন ব্যাপী একটি বিরাট মেলা হয়। কথিত আছে, এই তিথিতে শ্রীচৈতন্যদেব কুলিয়া গ্রাম নিবাসী বৈষ্ণব-নিন্দক পণ্ডিত দেবানন্দের অপরাধ মার্জ্জনা করেন। তদবধি কুলিয়া অপরাধভঞ্জনের পাট নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। উক্ত তিথিতে এখানে আসিয়া পূজা অর্চ্চনা করিলে সর্ব্ব পাপ ও অপরাধ দূর হয় বলিয়া লোকের বিশ্বাস।



ঘোষপাড়ার মন্দির

কাঁচড়াপাড়া হইতে ৫ মাইল দূরে নদীয়া জেলায় কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র **ঘোষপাড়া** গ্রাম অবস্থিত। আউলচাঁদ নামক একজন সাধক এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। কর্ত্তাভজাদের মধ্যে অনেকে বলেন যে শ্রীচৈতন্যদেব পুরীধামে অন্তর্ধান করিবার পর বহুকাল পরে পুনরায় আউলচাঁদ রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া "গুরু সত্য" এই মহামন্ত্র প্রচার করেন। জনশ্রুতি যে উলা (বীরনগর) নিবাসী মহাদেব নামক জনৈক বারুজীবী ১৬১৬ শকাব্দের (১৬৯৪ খৃষ্টাব্দ) ফাল্গুন মাসের প্রথম শুক্রবারে তাঁহার পানের বরজের মধ্যে একটি অজ্ঞাত কুলশীল সুদর্শন বালককে দেখিতে পান। মহাদেব তাহাকে গৃহে আনিয়া পুত্রবৎ প্রতিপালন করেন এবং তাহার নাম রাখেন পূর্ণচন্দ্র। মহাদেবের যত্নে পূর্ণচন্দ্র হরিহর নামক জনৈক বৈষ্ণবের নিকট সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। প্রায় বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী ফুলিয়ায় গিয়া বলরাম

দাসের নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং তখন হইতে তাঁহার নাম হয় আউলচাঁদ। কর্ত্তাভজাগণকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি শাখা বলা যাইতে পারে। নিজ ধর্ম্মকে ইহারা সত্যধর্ম্ম বা সহজধর্ম্ম বলিয়া থাকেন। ইহাদের মতে কর্ত্তা বা ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা এবং গুরুই ঈশ্বরের প্রতিনিধি। এই সম্প্রদায়ের গুরুগণ "মহাশয়" ও শিষ্যগণ "বরাতি" নামে অভিহিত হন। এই সম্প্রদায়ের সাধন বিষয়ে কতকগুলি গুহ্য রহস্য আছে, সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি ছাড়া অপরে উহা জানিতে পারে না। দিনে পাঁচবার ইহাদের মন্ত্রজপ করিতে হয়। শুক্রবারকে পবিত্রজ্ঞানে এই দিন ইহারা উপবাসে এবং ধর্ম্মকর্ম্মে অতিবাহিত করেন। মদ্য ও মাংস ইহাদের নিকট নিষিদ্ধ বলিয়া কথিত। সাধনক্ষেত্রে ইহাদের মধ্যে জাতিভেদ না থাকিলেও ব্যবহারিক জীবনে ইহারা জাতিভেদ প্রথা মানিয়া চলেন।



হিমসাগর দীঘি, ঘোষপাড়া

কথিত আছে, যে এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক আউলচাঁদের ২২ জন শিষ্য ছিল। উহাদের মধ্যে সদ্গোপ বংশীয় রামশরণ পাল আউলচাঁদের মৃত্যুর পর গুরুর পদ প্রাপ্ত হন। বর্ত্তমানে রামশরণের বংশধরগণই ঘোষপাড়ায় থাকিয়া এই সম্প্রদায়ের পরিচালনা করেন। রামশরণের স্ত্রী অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। শিষ্যগণ তাঁহাকে "সতী মা" নামে অভিহিত করিতেন। সতীমায়ের সমাধিস্থান ডালিমতলা ঘোষপাড়ার একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান। কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে একবার রামশরণের স্ত্রী অত্যন্ত পীড়িত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে আউলচাঁদ নিকটস্থ পুষ্করিণী হইতে কিছু মৃত্তিকা লইয়া তাঁহার গায়ে মাখাইয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ রোগমুক্ত ও সুস্থ করিয়াছিলেন। আউলচাঁদ তাঁহার সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন বলিয়া আশ্চর্য্যভাবে অন্তর্হিত হন। তিনিই রামশরণের পুত্র রামদুলাল রূপে জন্ম গ্রহণ করেন বলিয়া কথিত। ঘোষপাড়ায় হিমসাগর নামে একটি দীঘি আছে। অনেকের বিশ্বাস যে ইহার জলের রোগ আরোগ্য করিবার

আশ্চর্য্য শক্তি আছে। প্রবাদ যে ইহার জল চোখে দিয়া জনৈক অন্ধ দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়াছিল। রথযাত্রা ও দোলের সময় এখানে বিশেষ সমারোহ হয়। ইহা ছাড়া রামশরণের পুত্র রামদুলালের মৃত্যু তিথিতেও এখানে মহোৎসব হইয়া থাকে। ঘোষপাড়ার দোলের মেলা খুবই প্রসিদ্ধ। এই মেলা সপ্তাহকাল স্থায়ী হয় এবং এই উপলক্ষে এখানে নানাস্থান হইতে সহস্র সহস্র নরনারীর সমাগম হয়।



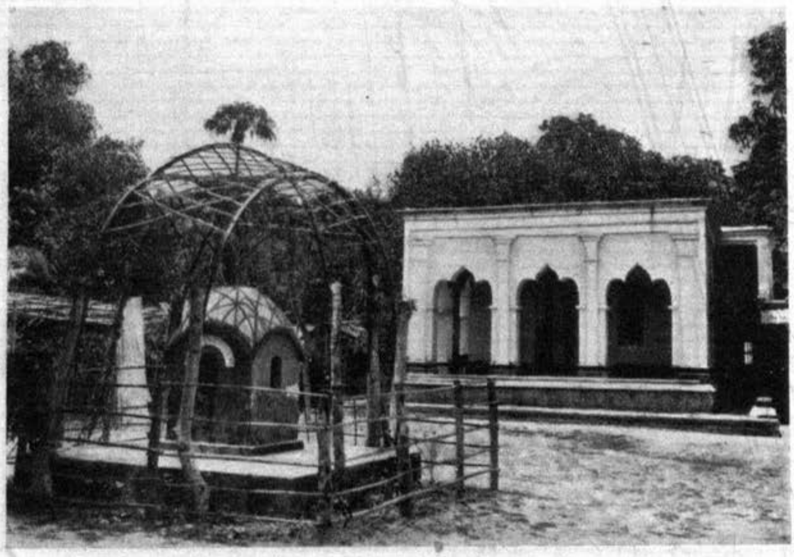
জগন্নাথদেবের দোলমঞ্চ, যশোড়া

কাঁচড়াপাড়া স্টেশন হইতে ঘোষপাড়া ও কুলিয়ার পাট যাইবার জন্য ঘোড়ার গাড়ী পাওয়া যায়। মেলার সময় এই দুই স্থানেই কাঁচড়াপাড়া হইতে মোটর বাস যাতায়াত করে।

শিমুরালি—কলিকাতা হইতে ৩৬ মাইল দূর। স্টেশন হইতে প্রায় এক মাইল দূরবর্ত্তী যশোড়া গ্রাম প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট। এখানে জগন্নাথদেবের একটি মন্দির আছে। কথিত আছে যে বৃদ্ধ বয়সে জগদীশ পণ্ডিত

শ্রীক্ষেত্রে গমন করেন। সেখানে জগন্নাথদেবের নবকলেবর ধারণকালে তিনি পুরাতন প্রতিমূর্ত্তিটি পুরী হইতে স্বয়ং পদব্রজে বহন করিয়া যশোড়ায় আনয়ন ও প্রতিষ্ঠা করেন। স্নানযাত্রার সময় যশোড়ায় বহু জনসমাগম হয়। প্রতিবৎসর পৌষ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে যশোড়ায় জগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং মাঘী পূর্ণিমা ও গঙ্গাস্নানের যোগ উপলক্ষেও এখানে বহু লোকের সমাবেশ হয়।

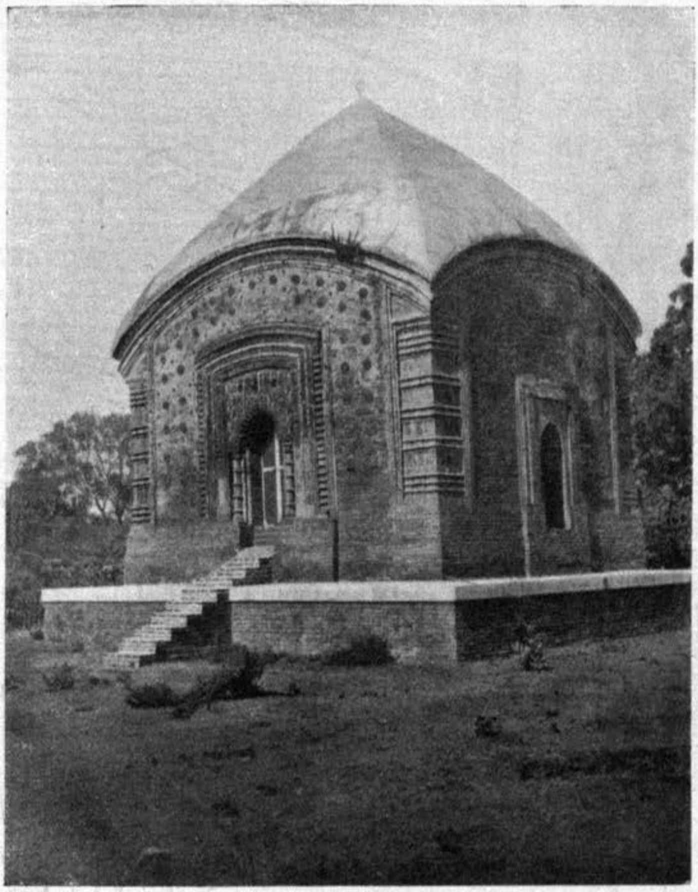
চাকদহ—কলিকাতা হইতে ৩৮ মাইল দূর। এই স্থানের প্রাচীন নাম চক্রদ্বীপ বা চক্রদহ। প্রবাদ, গঙ্গা আনয়নের সময় ভগীরথের রথের চক্র এখানে একটি গভীর খাত খনন করিয়া গিয়াছিল, গঙ্গাজলে পূর্ণ হইয়া উহার নাম হয় চক্রদহ বা চাকদহ। এই স্থান বিশেষ পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। রেল খুলিবার পূর্ব্বে যশোহর ও খুলনা



মহেশ পণ্ডিতের ফুলসমাজ বেদী ও মন্দির, চাকদহ

অঞ্চলের বহু লোক চাকদহে গঙ্গাস্নান করিতে আসিতেন। চাকদহ হইতে বনগ্রাম হইয়া যশোহর পর্য্যন্ত একটি পাকা রাস্তা আছে। এখনও বহুদূর হইতে লোকে এখানে শবদাহ করিতে আসে। বর্ত্তমানে চাকদহ হইতে গঙ্গা প্রায় দেড় মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছে। চাকদহ গ্রামের নিম্নে গঙ্গার পুরাতন খাত এখনও বর্ত্তমান আছে। প্রাচীন কালে গঙ্গাসাগরের ন্যায় এই স্থানেও লোকে শিশু সন্তান নিক্ষেপ করিত ও অনেকে মুক্তি প্রাপ্তির আশায় চক্রদহের জলে ডুবিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিত। কথিত আছে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে মহারাজ মানসিংহ যখন মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার জন্য বাংলায় আগমন করেন তখন তাঁহার সৈন্যদলকে ঝড়বৃষ্টির জন্য কয়েকদিন এই স্থানে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। চাকদহ স্টেশন হইতে মাত্র সাত আট মিনিটের

পথ **কাঁঠালপুলি** নামক পল্লীতে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম মহেশ পণ্ডিতের ফুলসমাজ বেদী ও শ্রীপাট অবস্থিত। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে মহেশ পণ্ডিতের তিরোভাব উপলক্ষে এখানে বৈষ্ণবদিগের একটি মহোৎসব হয়। যশোড়ার জগদীশ পণ্ডিত এই মহেশ পণ্ডিতের ভ্রাতা ছিলেন। চাকদহ যে এককালে একটি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল



পালপাড়ার মন্দির, চাক্‌দহ (প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে)

তাহা ইহার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়। বহু অট্টালিকা ও দেবায়তনের ধ্বংসাবশেষ গভীর অরণ্য সমাচ্ছন্ন হইয়া এই গ্রামখানিকে এক অপরূপ নীরবতা ও গাম্ভীর্য্য প্রদান করিয়াছে। এখানে এখনও একটি মিউনিসিপ্যালিটি আছে। চাকদহের আনন্দগঞ্জবাজারে মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষে মহাধুমধামের সহিত গণেশ-জননী মূর্ত্তির পূজা হয় এবং প্রায় পক্ষকাল স্থায়ী একটি বিরাট মেলা বসে।

চাকদহের নিকটবর্ত্তী **পালপাড়া** গ্রামে হিন্দু আমলে নির্ম্মিত একটি প্রাচীন মন্দির আছে। শিমুরালি ও চাকদহের প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত এই মন্দিরটি রেলগাড়ীতে

বসিয়াই দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরটি যে স্থানে অবস্থিত উহা চতুর্দ্দিকের ভূমি হইতে অনেক উচ্চ। এই মন্দিরের ছাদ চৌচালার আকারে নির্ম্মিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল ইটের দ্বারা গঠিত ও অপূর্ব্ব কারুকার্য্যময় এই মন্দিরটি বর্ত্তমানে সরকারী "রক্ষিত-কীর্ত্তির" অন্তর্গত। কবে কাহার দ্বারা এই মন্দির স্থাপিত হইয়াছিল তাহা নির্ণীত হয় নাই। ইহা অন্ততঃ ৫০০ শত বৎসরের পুরাতন হইবে। মন্দিরের নিকটে প্রদ্যুম্ন সরোবর নামে একটি অতি পুরাতন দীঘি আছে। জমিদারগণের প্রাচীন দলিলাদিতে প্রদ্যুম্ন হ্রদ ও প্রদ্যুম্ননগরের উল্লেখ আছে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন মুক্তবেণীর স্থান নির্দ্দেশ করিতে গিয়া প্রদ্যুম্ন নগরের নাম করিয়াছেন। অনেকে অনুমান করেন যে অতি প্রাচীনকালে চাকদহ প্রদ্যুম্ননগর নামে একটি বিশাল নগরের অন্তর্গত ছিল। জনশ্রুতি যে শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন চক্রতীর্থে সিদ্ধিলাভ করিয়া এই স্থানে স্বীয় নামে একটি নগর স্থাপন করেন। আবার কাহারও কাহারও মতে প্রদ্যুম্ন রায় নামক জনৈক হিন্দু নরপতি এই নগরের প্রতিষ্ঠাতা। শিমুরালি হইতে চাকদহ পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে বহু উচ্চ ভিটা ও পুষ্করিণী দৃষ্ট হয়। এই সকল স্থান খনন করিলে বহু পুরাতন কীর্ত্তির সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া অনেকের অভিমত। প্রসিদ্ধ "কুলার্ণবতন্ত্র" প্রণেতা তান্ত্রিক পণ্ডিত নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার মহাশয় পালপাড়ার অধিবাসী ছিলেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে লর্ড বিশপ হিবর তাঁহার রোজনামচায় এই পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

রাণাঘাট জংশন—কলিকাতা হইতে ৪৫½ মাইল দূর। ইহা চূর্ণী নদীর তীরে অবস্থিত ও নদীয়া জেলার অন্যতম মহকুমা। প্রবাদ, বহু পূর্ব্বে এখানে রণা নামক একজন দস্যু সর্দ্দার বাস করিত। রণার ঘাঁটি বা আড্ডা হইতে "রাণাঘাট" নাম হইয়াছে অনেকে এইরূপ অনুমান করেন। এখানে সিদ্ধেশ্বরী নামে এক কালী আছেন, এই কালী রণা দস্যুর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত। রাণাঘাটে পাল চৌধুরী জমিদারগণের বাস। ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষ কৃষ্ণপান্তি অতি মহৎ ও সদাশয় লোক ছিলেন। কথিত আছে, ওয়ারেন্ হেস্টিংস্ ইহাকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করিতে চাহিলে ইনি তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই এবং কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রদত্ত "পাল-চৌধুরী" উপাধিতে সন্তুষ্ট ছিলেন। ইনি ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। রাণাঘাটে একটি মেডিক্যাল মিশন আছে; নদীয়ার ভূতপূর্ব্ব কলেক্টর মনরো সাহেব ইহার প্রতিষ্ঠাতা। রাণাঘাট শহরের উপকণ্ঠে দয়াবাড়ী নামক স্থানে একটি বৃহৎ চিকিৎসালয় ও একটি বিদ্যালয় আছে। রাণাঘাটের পান্তয়া খুব বিখ্যাত।

রাণাঘাট হইতে ৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে চূর্ণী নদীর উভয়তীরে হরধাম ও আনন্দধাম নামে কৃষ্ণনগর রাজবংশীয়গণের দুইটি আবাসস্থল আছে। হরধাম মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। ইহার অট্টালিকা প্রভৃতি এখন ধ্বংসোন্মুখ। এখানে চিন্ময়ী নামে এক প্রাচীন কালী আছেন।

রাণাঘাট জংশন হইতে পূর্ব্ববঙ্গ রেল পথের এক শাখা কৃষ্ণনগর ও মুর্শিদাবাদ হইয়া লালগোলা ঘাট পর্য্যন্ত এবং তথা হইতে খেয়া জাহাজে গঙ্গা পার হইয়া গোদাগাড়ীঘাট হইতে মাঝারি মাপের লাইনে মালদহ হইয়া কাটিহার পর্য্যন্ত গিয়াছে। দ্বিতীয় একটি

শাখা ২০ মাইল দূরবর্ত্তী খুলনা শাখা লাইনের উপর অবস্থিত বনগ্রাম জংশন পর্য্যন্ত গিয়াছে; এই শাখা পথে মাঝেরগ্রাম ও গোপালনগর উল্লেখযোগ্য স্টেশন। তৃতীয় একটি শাখা ১৩ মাইল দূরবর্ত্তী শান্তিপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে; এই পথে তিনটি স্টেশনের মধ্যে ফুলিয়া ও শান্তিপুর প্রধান।

রাণাঘাট জংশন হইতে **মাঝেরগ্রাম** ৯ মাইল দূর। এই স্থানের তিন মাইল উত্তরে "দেগাঁর ঢিবি" নামে একটি প্রাচীন ছুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, ইহা দেবপাল বা দেপাল নামক কুম্ভকার জাতীয় রাজার রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ। দেগাঁর প্রাচীন নাম দেবগ্রাম। ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গলে" দেগাঁএর দেপাল রাজার উল্লেখ আছে। জনশ্রুতি যে এই দেবপাল জনৈক সন্ন্যাসীর নিকট হইতে একখানি পরশ পাথর অপহরণ করিয়া বিপুল ধনসম্পত্তি লাভ করেন ও স্বীয় নামানুসারে বাস-স্থানের নাম দেবগ্রাম রাখিয়া তথায় স্বাধীন রাজার ন্যায় রাজ্য করিতে থাকেন। কালক্রমে স্থানীয় মুসলমান শাসন কর্ত্তার সহিত তাঁহার মনোমালিন্য উপস্থিত হইলে তিনি উহার মীমাংসা করিবার জন্য দিল্লীতে বাদশাহের নিকট গমন করেন। যাত্রাকালে তিনি জয় ও বিজয় নামক শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের ছুইটি পারাবত সঙ্গে লইয়া যান এবং স্বীয় মহিষীকে বলিয়া যান যে যদি দরবারে তিনি সফলকাম হন তবে শ্বেত পারাবত জয়কে ছাড়িয়া দিবেন; সে দ্রুতগতিতে উড়িয়া এই শুভ সংবাদ বহন করিয়া আনিবে। আর যদি কৃষ্ণ পারাবত বিজয় প্রথমে আসে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে ফল অশুভ, তখন আত্মসম্মান রক্ষার জন্য মহিষীকে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। রাজা দেবপাল সম্রাট দরবারে সফলকাম হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার অনুচর ভুলক্রমে জয়ের পরিবর্ত্তে বিজয়কে মুক্ত করিয়া দেয়। কৃষ্ণ পারাবতের আগমন লক্ষ্য করিয়া মহারাণী বুঝিলেন যে সংবাদ অশুভ; তখন অন্তঃপুর মধ্যস্থ পুষ্করিণীতে ডুবিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। দেবপাল এই নিদারুণ ভুল সংশোধনের জন্য অতি দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তিনি পৌঁছিয়া দেখিলেন যে মহারাণী ইতিমধ্যেই প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। মনের ছুঃখে তিনিও সেই পুষ্করিণীতে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। দেবগ্রাম তখন মুসলমান শাসন-কর্ত্তার অধিকারে আসিল। অনেকে বলেন যে মুসলমান শাসন-কর্ত্তার নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া দেবপালের অনুচর ইচ্ছা করিয়া জয়ের পরিবর্ত্তে বিজয়কে ছাড়িয়া দিয়াছিল। দেগাঁর ঢিবিতে কারুকার্য্য খচিত বহু ইষ্টক এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থান এখন জঙ্গলের দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।

রাণাঘাট জংশন হইতে **গোপালনগর** স্টেশন ১৪ মাইল দূর। এই স্থান একটি বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানকার কাঁচাগোল্লা অতি উৎকৃষ্ট। গোপালনগর হইতে ৭ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত **চৌবেড়িয়া** গ্রাম "নীলদর্পণ" প্রণেতা প্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের জন্মস্থান। এই গ্রামটি যমুনা নদীর উপর অবস্থিত। ইহার প্রাচীন নাম চতুর্ব্বেষ্টিত ছুর্গ। এখানে মুসলমান আমলে কাশীনাথ রায় নামক জনৈক কায়স্থ বংশীয় রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার ছুর্গের চারিদিকের খাতেই যমুনা নদী প্রবাহিত হইত বলিয়া ইহার নাম ছিল চতুর্ব্বেষ্টিত ছুর্গ। এই ছুর্গটি ছুর্ভেদ্য ও সুরক্ষিত ছিল। রাজা কাশীনাথ রায় পাঠান বিজয়ে মোগল বাহিনীকে বিশেষ সাহায্য করিয়া রণনৈপুণ্যের

জন্য সম্রাট আকবরের নিকট হইতে "সমরসিংহ" উপাধি লাভ করেন। পরে তিনি বিশ্বাসঘাতকগণ কর্তৃক নিহত হইলে তাঁহার মহিষীর অভিযোগক্রমে আকবরের রাজস্ব-সচিব ও অন্যতম সেনাপতি তোডরমল্ল বিদ্রোহীগণকে যথোচিত দণ্ড প্রদান করেন এবং চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গে একটি দরবার করিয়া সেই স্থান হইতেই সর্ব্ব প্রথম আকবরের বঙ্গবিজয় ঘোষণা করেন। চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গকে পটভূমি করিয়া সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার "বঙ্গ বিজেতা" নামক উপন্যাস রচনা করেন। বর্ত্তমানে এই দুর্গের কোনই চিহ্ন নাই, উহা যমুনাগর্ভে বিলীন হইয়াছে। প্রাচীন চতুর্ব্বেষ্টিত বা চৌবেড়িয়া এখন রাজার বাগান, ফুলবাড়ী ও সেহালা নামক তিনটি বিভিন্ন পল্লীতে বিভক্ত হইয়াছে।

ফুলিয়া—শান্তিপুর শাখায় রাণাঘাট হইতে ৯ মাইল এবং কলিকাতা হইতে ৫৪ মাইল দূর। ফুলিয়া "ভাষা-রামায়ণ"-কার মহাকবি কৃত্তিবাসের জন্মস্থান। ১৪৪০ খৃষ্টাব্দের মাঘমাস রবিবার শুক্লা পঞ্চমীর দিন সরস্বতী পূজার শুভবাসরে বাণীর বরপুত্র মহাকবি কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বনমালী ও মাতার নাম মালিনী দেবী। ইহারা মুখুটি ব্রাহ্মণ; এই বংশের নবাব প্রদত্ত উপাধি ছিল "ওঝা"। কৃত্তিবাসের সময়ে ফুলিয়া অতি সমৃদ্ধ স্থান ছিল; তখন ইহার দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইত। আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন,

"গ্রামরত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি।
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিণী॥"

গুরু গৃহে শিক্ষা সমাপনান্তে কৃত্তিবাস পণ্ডিতরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। রাজপণ্ডিত হইবার আশায় তিনি গৌড়েশ্বরের সভায় গমন করেন এবং স্বরচিত পাঁচটি সংস্কৃত শ্লোক রাজার নিকট প্রেরণ করেন। রাজসভায় তিনি যথেষ্ট সম্মান লাভ করেন। গৌড়েশ্বরের ইচ্ছানুসারে তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া বঙ্গভাষায় রামায়ণ রচনা করিতে আত্মনিয়োগ করেন। এই গৌড়েশ্বর কে ছিলেন, তদ্বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে; কেহ কেহ বলেন যে তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণই কৃত্তিবাস বর্ণিত গৌড়েশ্বর, আবার কাহারও কাহারও মতে রাজা গণেশ ও এই গৌড়েশ্বর অভিন্ন। কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণই বাংলা ভাষার আদি কাব্য বলিয়া অনেকের অভিমত। কৃত্তিবাস বাল্মীকির রামায়ণের যথাযথ অনুবাদ না করিয়া উহার আখ্যানভাগ অবলম্বনে মৌলিক মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। স্থানে স্থানে তিনি অন্যান্য পুরাণ হইতে বা কথকগণের প্রমুখাৎ শ্রুত হইয়া আখ্যান ভাগের মধ্যে নব নব বিষয়ের সন্নিবেশ করিয়াছেন। কৃত্তিবাস বর্ণিত শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গাপূজা, হনুমান কর্ত্তৃক রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ, মহীরাবণ বধ ও লবকুশের যুদ্ধ প্রভৃতি সুপরিচিত বিষয়গুলি বাল্মীকির রামায়ণে দৃষ্ট হয় না। অধুনা কৃত্তিবাসী রামায়ণ নামে বাজারে যাহা বিক্রয় হয়, উহাতে কৃত্তিবাসের আদি রচনার সন্ধান অতি অল্পই পাওয়া যায়। প্রায় আশী বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার নামক একজন অধ্যাপক ছিলেন। কৃত্তিবাসের আমলের প্রাচীন ভাষাকে সাধারণের সুবোধ্য করিবার জন্য তিনি কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভাষার প্রায় আমূল সংস্কার করেন। কৃত্তিবাসের নামে

প্রচলিত রামায়ণ প্রকৃতপক্ষে "জয়গোপালী" রামায়ণ। সম্প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে কৃত্তিবাসের মূল রচনা প্রকাশের প্রচেষ্টা চলিতেছে এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণের কিয়দংশ প্রকাশিতও হইয়াছে।

কৃত্তিবাসের সময়ের গ্রামরত্ন ফুলিয়া এখন জনবিরল পরিত্যক্ত পল্লীর রূপ ধারণ করিয়াছে। ফুলিয়া হইতে গঙ্গা এখন প্রায় ৪ মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছে। ২৬ বৎসর



কৃত্তিবাস স্মৃতিস্তম্ভ, ফুলিয়া

পূর্ব্বে মহাকবি কৃত্তিবাসের ধ্বংসপ্রাপ্ত জন্মভিটায় সাহিত্যসেবীদিগের উদ্যোগে একটি স্মৃতি স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়। উহার পার্শ্বে "কৃত্তিবাস কূপ" নামে একটি কূপ ও সম্মুখস্থ বিস্তৃত অঙ্গনের অপর দিকে "কৃত্তিবাস স্মৃতি বিদ্যালয়" নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর মাঘ মাসে শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে কৃত্তিবাসের জন্মভিটায়

সাহিত্যসেবী ও স্বজাতিপ্রেমিক বাঙালীদিগের একটি সম্মেলন হয়। শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেরই বাংলার আদি কবি ও অন্যতম প্রধান জনশিক্ষক মহাকবি কৃত্তিবাসের জন্মস্থানকে তীর্থের ন্যায় পবিত্রজ্ঞানে শ্রদ্ধার সহিত দর্শন করা কর্ত্তব্য। কৃত্তিবাসের স্মৃতি স্তম্ভের গাত্রে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিত আছে,—

"মহাকবি কৃত্তিবাসের
আবির্ভাব—১৪৪০ খৃষ্টাব্দ, মাঘমাস, শ্রীপঞ্চমী, রবিবার
হেথা দ্বিজোত্তম
আদি কবি বাঙ্গালার ভাষা রামায়ণকার
কৃত্তিবাস লভিলা জনম,
সুরভিত সুকবিত্বে ফুলিয়ার পুণ্যতীর্থে
হে পাথিক, সম্ভ্রমে প্রণম।
শ্রীযুক্ত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী কর্ত্তৃক ভিত্তি স্থাপিত হইল।
২৭শে চৈত্র, ১৩২২ বঙ্গাব্দ।"



হরিদাস ঠাকুরের ভজন-গোফা, ফুলিয়া

সমাধি স্তম্ভের দক্ষিণদিকে একটি প্রাচীন বটবৃক্ষের নীচে একটি ভগ্ন ইষ্টক স্তূপ আছে। উহা কৃত্তিবাসের দোলমঞ্চ নামে পরিচিত। আশপাশের জমি হইতে কৃত্তিবাসের জন্মভিটা অনেক উচ্চ। অনুমান হয় যে এই স্থান খনন করিলে অনেক অট্টালিকাদির সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

কৃত্তিবাসের জন্মভিটার অতি নিকটে অবস্থিত হরিদাস ঠাকুরের সাধনপীঠ ফুলিয়ার অন্যতম দ্রষ্টব্য। বৈষ্ণব সাহিত্যে বর্ণিত আছে যে "যবন" হরিদাস বা ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুর বেনাপোল পরিত্যাগ করিবার পর শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যের সহিত মিলিত হন

এবং নিকটবর্ত্তী ফুলিয়া গ্রামে গঙ্গাতীরে একটী "গোফা" বা মৃত্তিকা গাত্রে নিম্মিত কুটীরের মধ্যে ভজন সাধন করিতে থাকেন। মুসলমান হইয়া তিনি হিন্দুধর্ম্মের অনুষ্ঠান করায় কাজীর অভিযোগ অনুসারে মুলুকপতি বা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে লোকজন দিয়া ধরিয়া লইয়া যান এবং বহু যুক্তিতর্কের দ্বারাও তাঁহাকে স্বমতে আনিতে সমর্থ না হওয়ায় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে একে একে বাইশ বাজারে লইয়া গিয়া বেত্রাঘাত করিবার আদেশ দেন। সাধারণতঃ দুই তিন বাজারে মার খাইলেই লোকের জীবনান্ত হইত, কিন্তু ভক্ত শিরোমণি হরিদাস বাইশ বাজারে অতি গুরুতরভাবে প্রহৃত হইয়াও কোন রূপ দুঃখপ্রকাশ করিলেন না। যে সমস্ত লোক তাঁহাকে বিনাদোষে নির্য্যাতন করিতেছিল, তাহাদের অপরাধের কথা স্মরণ করিয়া তিনি করযোড়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন,



ফুলিয়ার মঠের বিগ্রহ

"এ সব জীবেরে প্রভু করহ প্রসাদ।
মোরে দ্রোহে নহু এ সবার অপরাধ॥"

জগৎ-প্রেমিক যীশু খ্রীষ্টের পর এরূপ অপূর্ব্ব ক্ষমার আদর্শ জগতের ইতিহাসে আর দেখা যায় না। বৈষ্ণব জগতে ঠাকুর হরিদাসের স্থান অতি উচ্চে। স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে "পৃথিবীর শিরোমণি" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

হরিদাসের অপূর্ব্ব প্রভাবের পরিচয় পাইয়া কাজী ও মুলুকপতির মন ফিরিয়া গেল। তাঁহারা তাঁহাকে যথেচ্ছ বিচরণ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের স্বাধীনতা প্রদান করিলেন। হরিদাস ঠাকুর ফুলিয়ায় ফিরিয়া আসিয়া সেই গোফার মধ্যে অবস্থান করতঃ প্রত্যহ তিন লক্ষ নাম

গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ফুলিয়ার বিখ্যাত ব্রাহ্মণ সমাজ তাঁহার অনুগত হইল। অনেকেই ধর্ম্মালোচনার জন্য তাঁহার নিকট আগমন করিতেন। বৈষ্ণবগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে হরিদাস ঠাকুরের গোফার মধ্যে এক বিষধর সর্প বাস করিত। হরিদাসের ভক্তগণ এই সর্পের বিষের জ্বালায় গোফার নিকটে আসিতে পারিতেন না, কিন্তু হরিদাস নিজে এ সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না বা তাঁহার কোন কষ্টবোধই হইত না। ভক্তগণের মুখে সর্পের বৃত্তান্ত শুনিয়া তিনি তাঁহাদের সুবিধার জন্য গোফা ত্যাগের উদ্যোগ করিলে সর্পই সেখান হইতে অন্যত্র চলিয়া গেল।

কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণের পর নীলাচল গমনের পথে শ্রীচৈতন্যদেব সর্ব্বপ্রথম ফুলিয়ায় হরিদাস ঠাকুরের আশ্রমে আগমন করেন এবং নবদ্বীপ-বাসিগণ এই স্থানে আসিয়াই তাঁহার দর্শন লাভ করেন।

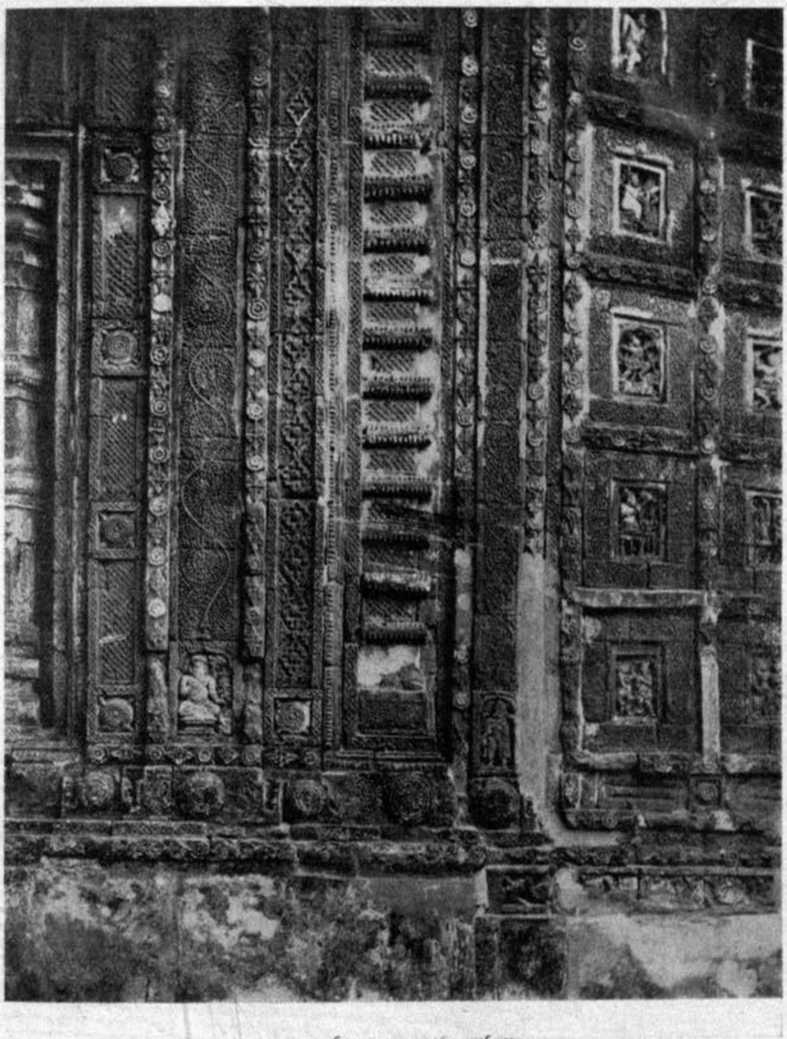
তরুকুঞ্জ-শোভিত হরিদাস ঠাকুরের সাধনপীঠটি অতি শান্তরসাস্পদ স্থান। এখানে একটি মন্দির মধ্যে বলরাম, রেবতী, শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার বিগ্রহ আছে। যে গোফায় বসিয়া হরিদাস ঠাকুর নাম জপ করিতেন, একটি বৃক্ষমূলে তাহার চিহ্ন আছে। মন্দিরের সম্মুখে একটি তুলসী বেদী ও কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সমাধি নামে পরিচিত অপর একটি বেদী আছে। এই মন্দিরটি জনসাধারণের নিকট "ফুলিয়ার মঠ" নামে পরিচিত। মঠমধ্যবর্ত্তী বিগ্রহ চতুষ্টয় দেখিতে অতি সুন্দর। এখানে প্রতি বৎসর দোল পূর্ণিমার সময় বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

শান্তিপুর—কলিকাতা হইতে ৫৮ মাইল দূর। ইহা একটি অতি প্রাচীন গ্রাম। এই স্থানটি কত প্রাচীন তাহা বলা কঠিন। প্রায় আট শত বৎসরের উপর হইতে শান্তিপুর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে শান্তিপুরের তিন দিক্ দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত ছিল, এখন কিন্তু গঙ্গা দূরে পশ্চিম দিকে সরিয়া গিয়াছে।

শান্তিপুর নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকে বলেন যে শান্ত নামক জনৈক মুনির বাস-স্থান ছিল বলিয়া এই স্থানের নাম শান্তপুর বা শান্তিপুর হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন যে শান্তিপুর গঙ্গাতীরে অবস্থিত বলিয়া অনেকে তাঁহাদের মৃতকল্প পিতামাতাকে সজ্ঞানে গঙ্গাতীরস্থ করিবার জন্য এখানে লইয়া আসিতেন। যাঁহারা দৈবাৎ রোগমুক্ত হইতেন তাঁহারা আর সংসারে ফিরিয়া না গিয়া এই স্থানেই শান্তিতে জীবন যাপন করিতেন। এইরূপ শান্তিপ্রিয় লোকদের লইয়া এই গ্রাম গঠিত হয় বলিয়া ইহার নাম শান্তিপুর হয়।

শান্তিপুর বৈষ্ণবদিগের একটি শ্রীপাট। ইহার অন্তর্গত বাবলা গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ অদ্বৈত আচার্য্যের পাটবাড়ী অবস্থিত। অদ্বৈত আচার্য্য শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউড় পরগণার নবগ্রাম নামক পল্লীতে ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কুবের আচার্য্য লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। মাত্র দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য অদ্বৈত শান্তিপুর আগমন করেন। তাঁহার প্রকৃত নাম কমলাক্ষ, অদ্বৈত আচার্য্য তাঁহার উপাধি। শান্তিপুরের অন্তঃপাতী পূর্ণবাটী গ্রাম নিবাসী শান্ত

বেদান্তবাগীশ নামক জনৈক অধ্যাপকের নিকট বেদচতুষ্টয় অধ্যয়ন করিয়া তিনি "বেদ পঞ্চানন" ও "অদ্বৈত আচার্য্য" উপাধি লাভ করেন। বিদ্যাশিক্ষান্তে অদ্বৈত গঙ্গাতীরবর্ত্তী শান্তিপুর গ্রামেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। বৈষ্ণবজগতে তিনি মহাবিষ্ণু

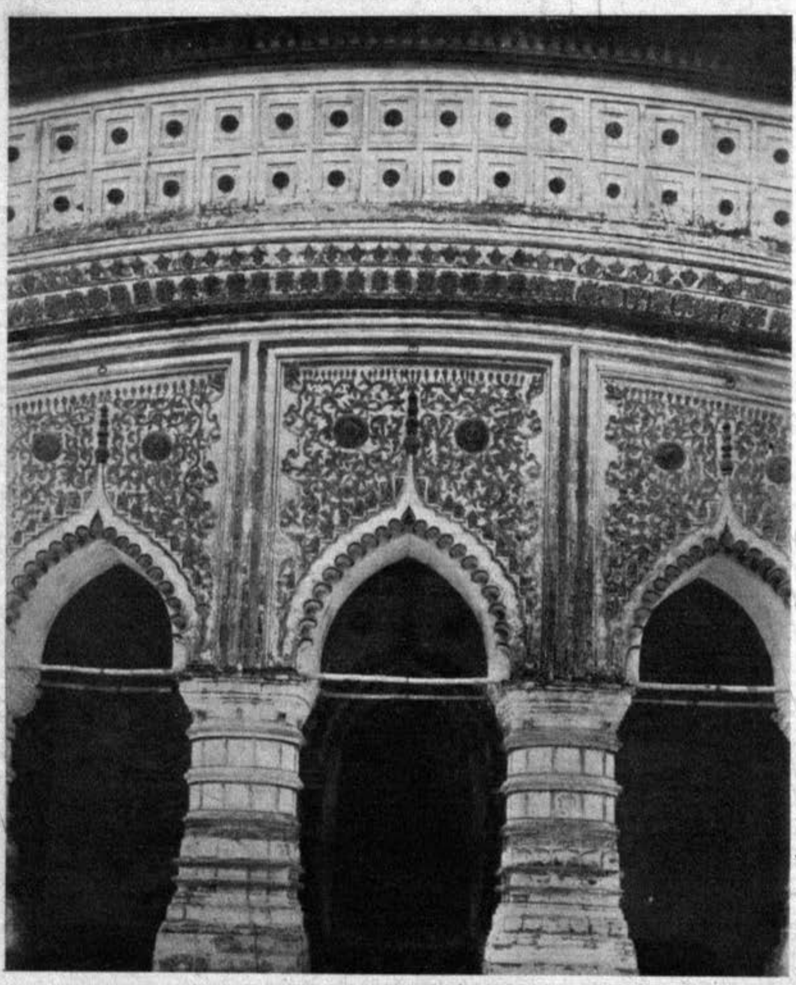


জলেশ্বর মন্দিরের কারুকার্য্য, শান্তিপুর

বা শিবের অবতার রূপে পূজিত। তাঁহার ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়াই গৌরাঙ্গদেব নবদ্বীপে অবতীর্ণ হন, বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে এইরূপ বর্ণিত আছে, যথা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে

"অদ্বৈতের কারণে চৈতন্য অবতার।
সেই প্রভু কহিয়াছেন বার বার॥"

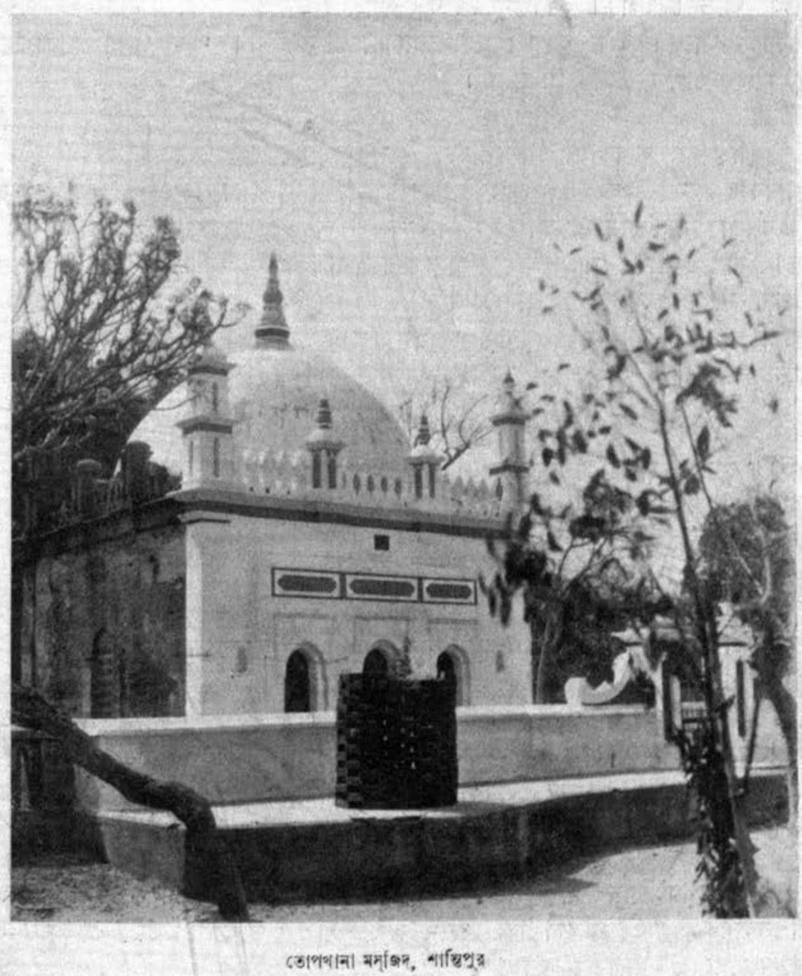
বৈষ্ণব জগতে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের পরেই অদ্বৈতাচার্য্যের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। অদ্বৈতের বয়স যখন ৫২ বৎসর সেই সময়ে চৈতন্যদেবের জন্ম হয়। শ্রীচৈতন্যদেব বহুবার গণসহ শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের বাটীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। অদ্বৈত দীর্ঘজীবী পুরুষ ছিলেন। ১২৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে শান্তিপুরেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়। তাঁহার অনেক গুলি পুত্র ছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র অচ্যুতানন্দ আজন্ম সংসার বিরাগী ছিলেন।



শ্যামচাঁদ মন্দিরের কারুকার্য্য—শান্তিপুর

অদ্বৈতের বংশধরগণ এখনও শান্তিপুরে বাস করিতেছেন। সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "অদ্বৈত প্রকাশ" প্রণেতা ঈশান নাগর ৫ বৎসর বয়স হইতে অদ্বৈত আচার্য্যের নিকট শান্তিপুরে মানুষ হন। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ৭০ বৎসর বয়সে আচার্য্য

পত্নী সীতাদেবীর আদেশে তিনি বিবাহ করেন। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি অদ্বৈত প্রকাশ সমাপ্ত করেন এবং বৃদ্ধ বয়সে লাউড়ে যাইয়া ধর্ম্মপ্রচারে মনোনিবেশ করেন। লাউড়-রাজ দিব্যসিংহ বৃদ্ধ বয়সে রাজ্যভার ছাড়িয়া শান্তিপুরে আসিয়া ধর্ম্মসাধনায় কাল যাপন করেন। তদবধি তিনি লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস নামে পরিচিত হন। তিনি অদ্বৈত আচার্য্যের "বাল্য লীলা" রচনা করেন এবং বিষ্ণুপুরী ঠাকুর কৃত সংস্কৃত কাব্য রত্নাবলীর বাংলা অনুবাদ করেন।



তোপখানা মসজিদ, শান্তিপুর

শান্তিপুরে অনেক গুলি মন্দির ও দেববিগ্রহ আছে। মন্দিরগুলির মধ্যে শ্যামচাঁদ, গোকুলচাঁদ ও জলেশ্বর মহাদেবের মন্দিরই সমধিক বিখ্যাত। শ্যামচাঁদের প্রকাণ্ড মন্দিরটি ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে শান্তিপুর নিবাসী তন্তুবায়কুলোদ্ভব রামগোপাল খাঁ চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে নিৰ্ম্মিত হয়। এই মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে খাঁ চৌধুরী

মহাশয় নানা স্থান হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন এবং কথিত আছে নদীয়ার মহারাজকেও শান্তিপুরে আনিয়া এক লক্ষ টাকা নজর দিয়া সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। গোকুলচাঁদের মন্দিরটি ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত। জলেশ্বর মহাদেবের মন্দিরটি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নদীয়ার মহারাজা রামকৃষ্ণের মাতা প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দির গুলি বাংলার শিল্পপদ্ধতি অনুসারে নির্ম্মিত এবং ইহাদের কারুকার্য্য অতি সুন্দর। বিশেষতঃ জলেশ্বর মন্দিরের প্রাচীর গাত্রে উৎকীর্ণ পৌরাণিক চিত্রাদির শিল্প চাতুর্য্য অতি চমৎকার। শান্তিপুরের বড় বাজারে সিদ্ধেশ্বরী কালী নামে এক প্রকাণ্ড কালীমূর্ত্তি আছে। এরূপ বড় বিগ্রহ সচরাচর দেখা যায় না। ইহা ছাড়া গোস্বামীদের নাট মন্দির ও পঞ্চরত্ন মন্দিরও দ্রষ্টব্য।

শান্তিপুরে অধিকাংশ পালাপার্ব্বণ বিশেষ আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হয়, তবে এখানকার রাসের উৎসবই দেশ বিখ্যাত। শান্তিপুরের ভাঙ্গা রাসের শোভাযাত্রা দেখিবার জন্য বাংলার নানা স্থান, এমন কি সুদূর ত্রিপুরা ও মণিপুর হইতেও বহু যাত্রীর সমাগম হয়। রাস উৎসবের শেষ দিন গোস্বামিগণের গৃহস্থিত বিগ্রহগণকে চতুর্দ্দোলের উপর স্থাপন করিয়া এক সঙ্গে শোভাযাত্রা সহকারে নগর প্রদক্ষিণ করানো হয়। ইহারই নাম "ভাঙ্গা রাস"। এই মেলায় সুন্দর দেশীয় পুতুল প্রভৃতি লোক-শিল্পের নিদর্শন এখনও বিক্রীত হয়।

মুসলমান যুগেও শান্তিপুর একটি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। পাঠান আমলে এই স্থানে একজন কাজী ছিলেন। বাদসাহ আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে ফৌজদার মহম্মদ ইয়ার খাঁ কর্ত্তৃক শান্তিপুরের তোপখানায় একটি সুদৃশ্য মসজিদ্ নির্ম্মিত হয়। ইহা শান্তিপুরের অন্যতম দ্রষ্টব্য বস্তু।

প্রাচীন কাল হইতেই শান্তিপুর বস্ত্র শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। এখানকার প্রস্তুত সূক্ষ্ম বস্ত্র পাশ্চাত্য দেশ সমূহেও রপ্তানি হইত। ইংরেজ রাজত্বের গোড়ার দিকে এখানে ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির একটি বড় কুঠি ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসর কোম্পানি দেড় লক্ষ পাউণ্ড বা সাড়ে বাইশ লক্ষ টাকার সূতির কাপড় প্রতিবর্ষে ক্রয় করিতেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ম্যানচেষ্টারের সস্তা কাপড় আসায় এই শিল্পের পতন আরম্ভ হয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এখানকার কুঠির ধ্বংসাবশেষ নীলাম করিয়া বিক্রয় করা হয়। বর্ত্তমানেও শান্তিপুর বস্ত্র শিল্পের জন্য বিখ্যাত।

নবদ্বীপের ন্যায় শান্তিপুরও পূর্ব্বে সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এখানকার পাণ্ডিতবর্গের মধ্যে শ্রীরাম গোস্বামী, চন্দ্রশেখর বাচস্পতি ও রামনাথ তর্করত্ন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্ সুপ্রসিদ্ধ হাস্যরসিক গোপালভাঁড় শান্তিপুরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার লোককে হাসাইবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাঁহার রসিকতা সম্বন্ধে বহু কাহিনী জনসমাজে প্রচলিত আছে। উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে শান্তিপুরে আশানন্দ মুখোপাধ্যায় নামে একজন বীরপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যেরূপ সরল প্রকৃতি ও সহৃদয় ছিলেন, তাঁহার দেহেও তদ্রূপ অমিতশক্তি ছিল।

বিপন্নের উদ্ধারের জন্য তিনি সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। একবার অতিথিরূপে তিনি জনৈক ধনী গৃহস্থের বাটীতে রাত্রি যাপন করেন। গৃহস্বামীর বাটীতে হঠাৎ একদল ডাকাত



আশানন্দ ঢেঁকির স্মৃতিস্তম্ভ, শান্তিপুর

পড়ে। আশ্রয়দাতা গৃহস্বামীর এইরূপ অতর্কিত বিপদ দেখিয়া মহাবীর আশানন্দ হাতের কাছে অন্য কোনরূপ অস্ত্র না পাইয়া নিকটবর্ত্তী ঢেঁকিশালা হইতে একটি প্রকাণ্ড ঢেঁকি

লইয়া দস্যুদলের সম্মুখীন হন এবং বীর বিক্রমে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেন। এই অদ্ভুত কার্য্যের জন্য তিনি জনসমাজে আশানন্দ ঢেঁকি নামে পরিচিত হন। তাঁহার বীরত্ব সম্বন্ধে এইরূপ বহু অদ্ভুত কাহিনী প্রচলিত আছে। কয়েক বৎসর হইল বীর আশানন্দের স্মৃতি রক্ষা কল্পে তদীয় বাসভবনে একটি স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্বজাতি প্রেমিক বাঙালী মাত্রেরই এই মহাবীরের স্মৃতিস্তম্ভমূলে শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত।

বর্ত্তমান যুগের অন্যতম মহাপুরুষ বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী শান্তিপুরের সুবিখ্যাত অদ্বৈত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ১২৫১ বঙ্গাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। যৌবনে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং তজ্জন্য গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া কলিকাতায় আসিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। দেবেন্দ্র নাথ তাঁহাকে ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারকের পদে নিযুক্ত করেন। একবার গয়ায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া বিজয়কৃষ্ণ একজন সিদ্ধ যোগী পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তাঁহাকেই গুরুরূপে বরণ করেন। যোগীর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বিজয়কৃষ্ণ পুনরায় সনাতন হিন্দুধর্ম্মে ফিরিয়া আসেন। ইহার পর তিনি গৈরিক বাস পরিধান করিলেন, জটাজুট রাখিলেন, মালা ধরিলেন এবং হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অলৌকিক যোগপ্রভাব সম্বন্ধে তাঁহার জীবনী-লেখকগণ বহু কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার বহু শিষ্য প্রশিষ্য এখনও বর্ত্তমান আছেন। শেষ বয়সে বিজয়কৃষ্ণ পুরীধামে বাস করিতেন। সেখানে তিনি "জটিয়া বাবা" নামে পরিচিত হন। পুরীধামের নরেন্দ্র সরোবরের তীরে তাঁহার সমাধি ও মঠ বিরাজিত আছে।

শান্তিপুরবাসী হরিমোহন প্রামাণিক মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় "কোকিল দূতম" নামক কাব্য ও "কমলা করুণা বিলাসম্" নামক নাটক লিখিয়া যশস্বী হন।

পল্লীগ্রাম হইলেও শান্তিপুর একটি শহর বিশেষ। এখানে মিউনিসিপালিটি আছে। এখানকার অন্যান্য দর্শনীয় স্থানের মধ্যে রিভার টমসন্ হল, শান্তিপুর সাহিত্য পরিষৎ, খোন্দকারদিগের স্থাপিত দাতব্য চিকিৎসালয়, গোস্বামীদের নাটমন্দির, পঞ্চরত্ন মন্দির ও মিউনিসিপ্যাল অফিস প্রভৃতি প্রধান।

শান্তিপুর হইয়া বড়মাপের লাইনের উপর অবস্থিত কৃষ্ণনগর দিয়া একটি লাইট রেলওয়ে ১৮ মাইল দূরবর্ত্তী নবদ্বীপঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছে। (কৃষ্ণনগর সিটি দ্রষ্টব্য)।

শান্তিপুরের নিকটস্থ অম্বিকা গ্রামে প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা গৌরীদাস পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। ইনি চৈতন্যদেবের বিশেষ অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন; শ্রীচৈতন্যের নিজ হাতে লেখা একখানি গীতা ইহার নিকট রক্ষিত ছিল। অম্বিকাগ্রামে ইনি চৈতন্যদেবের একটি নিম কাঠের বিগ্রহ স্থাপিত করিয়াছিলেন।

শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী **বাগ আঁচড়া** গ্রামে বাগ্‌দেবীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। কথিত আছে, ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রঘুনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক সাধক এই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন।

বাগ আঁচড়ার পার্শ্ববর্ত্তী **ব্রহ্মশাসন** গ্রামে প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত একটি ভগ্নপ্রায় শিবমন্দির আছে। চাঁদ রায় নামক জনৈক ব্যক্তি এই মন্দিরের

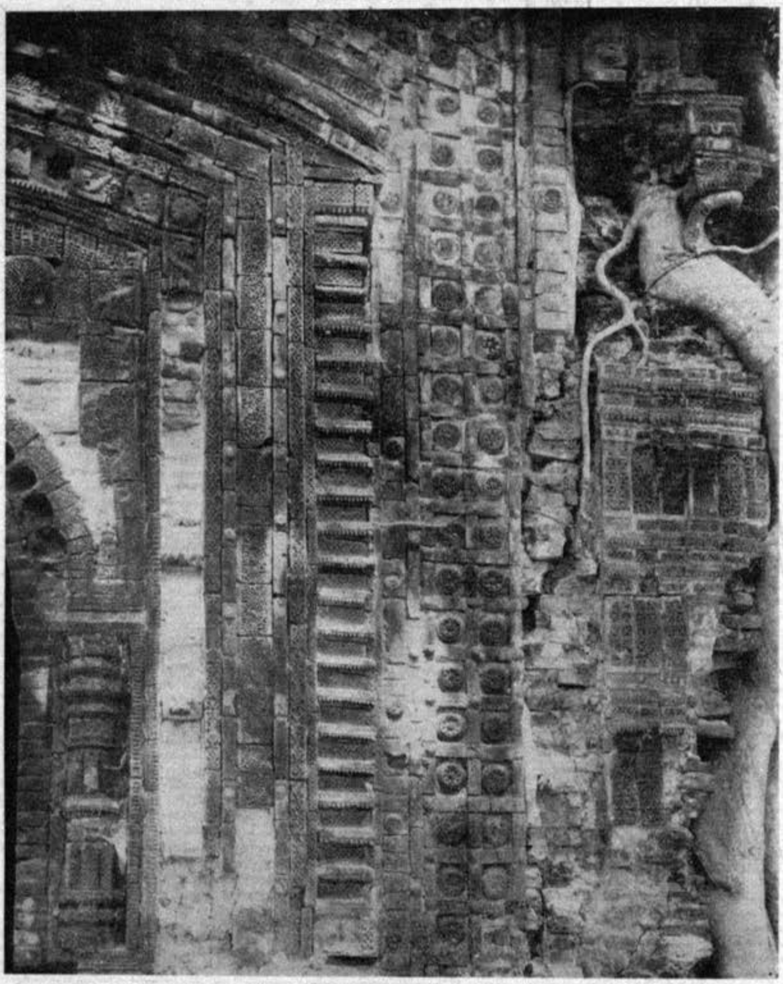
প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার নামানুসারে এই স্থানের নাম চাঁদড়া বা চাঁহুড়া হইয়াছে। এই চাঁদ রায় কে ছিলেন তাহা জানা যায় নাই। প্রবাদ, তিনি নাকি দস্যুবৃত্তি করিতেন এবং পরে ব্রহ্মশাপে সবংশে বিনষ্ট হন। ব্রহ্মশাসন গ্রামের এই শিবমন্দিরটি এক সময়ে সমগ্র



চাঁদরায়ের শিব মন্দির, ব্রহ্মশাসন

নদীয়া জেলার গৌরব স্বরূপ ছিল। একটি চতুষ্কোণ প্রাঙ্গনের চারিদিকে চারিটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। উত্তর দিকের মন্দিরটি এখনও দণ্ডায়মান আছে। ইহার চূড়া

নাই, ইহার সম্মুখস্থ ভিত্তির গাত্রে নানাবিধ মূর্ত্তি খোদিত আছে। পূর্ব্বদিকের দ্বারের উপর প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে নিম্নলিখিত লিপিটি খোদিত আছে :—

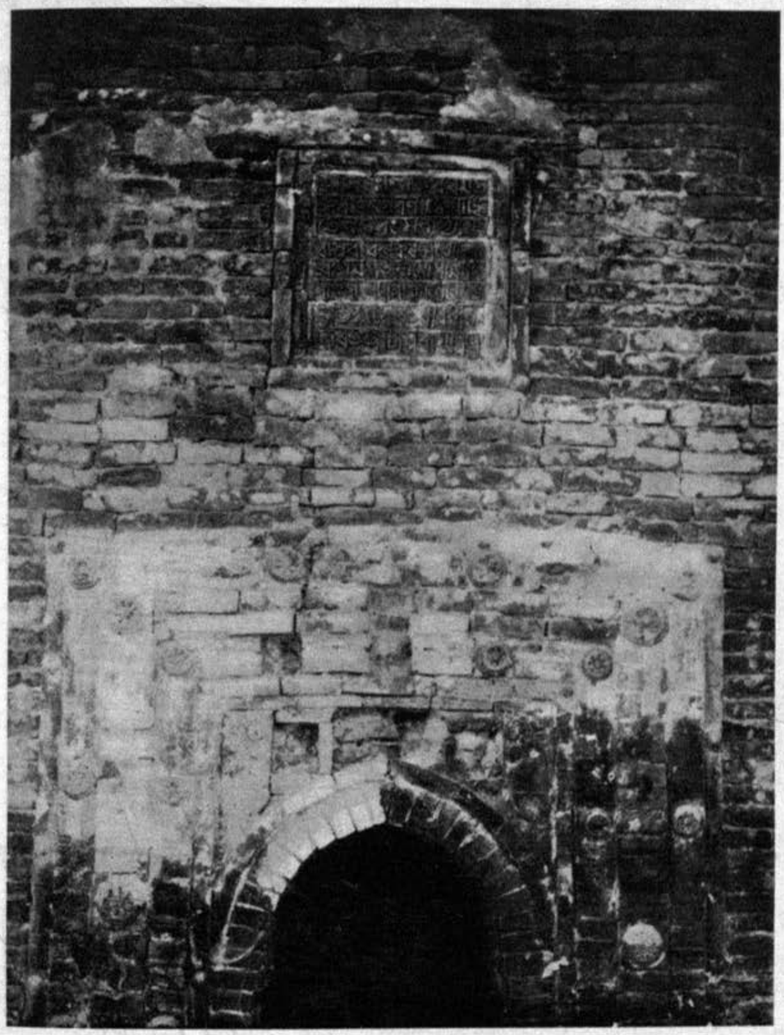


চাদরায়ের মন্দিরের কারুকার্য্য, ব্রহ্মশাসন

"শ্রীশিবঃ

শাকে বারমতঙ্গবাণ হরিনাঙ্কে নাঙ্কিতে শঙ্করং
সংস্থাপ্যাশু সুধা সুধাকর কর ক্ষীরোদনীরোপমং।
তস্মৈ সৌধমিদমুদা সুজলদানিলীনলোলধ্বজং
তৎপাদেরিত ধীর ধীরবিরতং শ্রীচাঁদরায় দদৌ ॥"

অর্থাৎ সতত স্থিরবুদ্ধি শ্রীচাঁদ রায় ১৮৫৭ শকে (১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে) সুধাসুধাকর ও ক্ষীর সমুদ্রের নীর তুল্য নিবিড় মেঘ সংলগ্ন ধ্বজ যুক্ত এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া শঙ্করের পদে অর্পণ করিলেন।



চাঁদরায়ের মন্দিরের শিলালিপি, ব্রহ্মশাসন

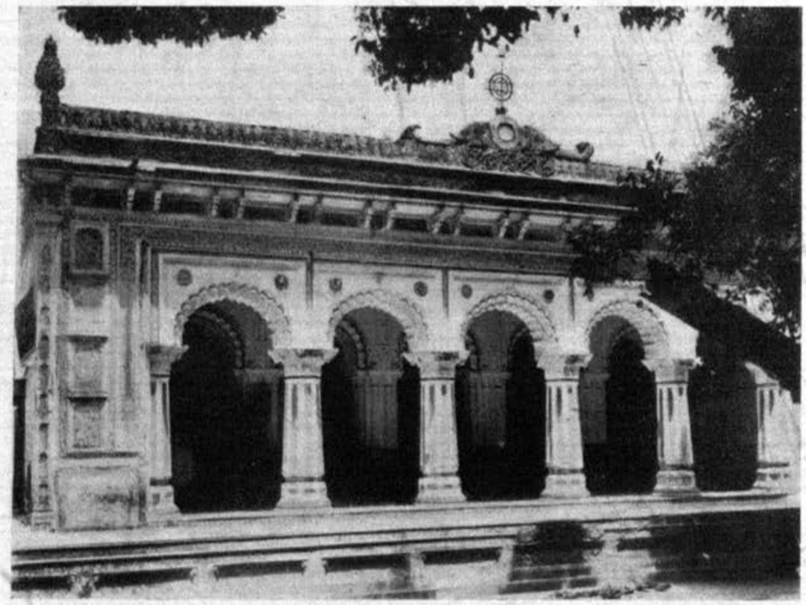
এই মন্দির গাত্রের কারুকার্য্যও অতি সুন্দর। দুঃখের বিষয়, অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষের দ্বারা এই মন্দিরটি যেরূপভাবে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে তাহাতে অচিরকাল মধ্যে ইহার সংস্কার ও সংরক্ষণের কোনরূপ ব্যবস্থা না হইলে প্রাচীন শিল্পকলার এই সুন্দর নিদর্শনটি শীঘ্রই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।

শান্তিপুর হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়া এই মন্দির দেখিয়া আসিতে পারা যায়।

আড়ংঘাটা—কলিকাতা হইতে ৫৬ মাইল দূরে চূর্ণী নদীর তীরে অবস্থিত। রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ কবিতা "দেবতার গ্রাসে" চূর্ণী নদী অমর হইয়া আছে। গঙ্গাসাগরের যাত্রীদল লইয়া নৌকা যখন ছাড়িয়া দিল তখন............

.........হেমন্তের প্রভাত শিশিরে
ছল ছল করে গ্রাম চূর্ণী নদীতীরে।

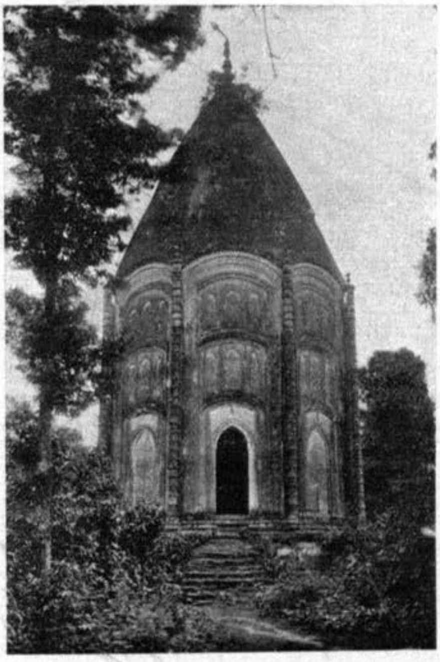
এখানে চূর্ণী নদীর তীরে যুগলকিশোর বিগ্রহের একটি মন্দির আছে। কথিত আছে, গঙ্গারাম দাস নামক জনৈক বৈষ্ণব বৃন্দাবন হইতে একটি শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ আনিয়া প্রথমে নবদ্বীপের নিকট সমুদ্রগড়ে স্থাপন করেন। বর্গির উপদ্রবের সময় গঙ্গারাম



যুগলকিশোরের মন্দির, আড়ংঘাটা

বিগ্রহটিকে লইয়া আড়ংঘাটায় চলিয়া আসেন। এখানে তাঁহার স্বদেশবাসী জনৈক বণিক তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করেন। যুগলকিশোরের মন্দিরটি আনুমানিক ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। প্রথমে শুধু শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহেরই পূজা হইত। কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র একটি রাধামূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্বে প্রতিষ্ঠা করিয়া উভয় বিগ্রহের "যুগল-কিশোর" নাম প্রদান করেন। যুগলকিশোরের সেবা নির্ব্বাহের জন্য তিনি বহু নিষ্কর ভূমিও দান করেন। কথিত আছে, একবার যুগল কিশোরের ধানের গোলা আগুনে পুড়িয়া গেলে রাণাঘাটের পালচৌধুরী বংশের আদিপুরুষ কৃষ্ণপান্তি অতি সামান্য মূল্যে ঐ গোলা ক্রয় করেন। কৃষ্ণপান্তির সৌভাগ্যবশতঃ গোলার ধান উপরের দিকেই

সামান্যমাত্র পুড়িয়াছিল, কিন্তু নীচেকার ধান বেশ ভালই ছিল। ঐ ধান বিক্রয় করিয়া কৃষ্ণপান্তি বিপুল অর্থলাভ করেন এবং উহা হইতেই তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্য্যের সূত্রপাত হয়। প্রতিবৎসর সমস্ত জ্যৈষ্ঠমাস ধরিয়া আড়ংঘাটায় যুগলকিশোরের মেলা হয়। মেলার যাত্রিগণের মধ্যে মহিলার সংখ্যাই অধিক। মহিলাদের মধ্যে একটি বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে জ্যৈষ্ঠমাসে যুগলকিশোরকে দর্শন করিলে ইহ বা পরজন্মে বৈধব্য ভোগ করিতে হয় না। যুগলকিশোরের মন্দিরের দক্ষিণে অপর একটি প্রাচীন মন্দিরে গোপীনাথজীউ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। প্রবাদ, আড়ংঘাটায় যুগলকিশোরের স্থাপনার পূর্ব্ব হইতেই এই বিগ্রহ এখানে বর্ত্তমান।



বুড়াশিবের মন্দির, শিবনিবাস (প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে)

মাজদিয়া—কলিকাতা হইতে ৬৫ মাইল দূর। এই ষ্টেশনের পূর্ব্ব নাম ছিল শিবনিবাস। ষ্টেশন হইতে শিবনিবাস দুই মাইল দূর। শিবনিবাস মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কর্ত্তৃক অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়। কথিত আছে, নসরত খাঁ নামক জনৈক দস্যুকে দমন করিবার জন্য কৃষ্ণচন্দ্র এই স্থানে উপস্থিত হইয়া শিবির সন্নিবেশ করেন। প্রাতঃকালে তিনি নদীতে মুখ প্রক্ষালন করিতেছেন, এমন সময়ে একটি রোহিত মৎস্য জল হইতে লাফাইয়া তাঁহার কোলের উপর গিয়া পড়ে। ইহা দেখিয়া রাজজ্যোতিষী বলেন "মহারাজ! রাজভোগ্য রোহিত মৎস্য যখন আপনা হইতেই আপনার অঙ্কে লাফাইয়া পড়িয়াছে তখন এই স্থান রাজবাসের একান্ত উপযুক্ত, আপনি এখানে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করুন।" এই স্থানটির

তিন দিকে ইছামতী নদী প্রবাহিতা বলিয়া স্থানটি বেশ সুরক্ষিত। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এখানে একটি নগর ও বহু দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া উহার নাম রাখেন শিবনিবাস। তাঁহার সময়ে এখানে ১০৮টি শিবমন্দির ছিল, কিন্তু এখন তাহার তিনটি মাত্র অবশিষ্ট আছে। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে বিশপ হিবর শিবনিবাসে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার লিখিত বৃত্তান্তে এই স্থানের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি এখানে চারিটি অতি সুন্দর মন্দির দেখিয়াছিলেন এবং এখানকার পুরাতন রাজ বাড়ীর প্রবেশ দ্বারকে "গথিক" স্থাপত্যের সুন্দর নিদর্শন বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহার গঠন প্রণালী মস্কো নগরীর প্রসিদ্ধ ক্রেমলিন প্রাসাদের পবিত্র ফটকের ন্যায়, কিন্তু দেখিতে আরও অনেক সুন্দর। কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে শিবনিবাস কাশীতুল্য বিবেচিত হইত। সেই জন্য একটি প্রবাদ বাক্য প্রচলিত হইয়াছিল—

শিবনিবাস তুল্য কাশী ধন্য নদী কঙ্কনা।
উপরে বাজে দেব ঘড়ি নীচে বাজে ঠঠনা॥

বর্ত্তমানে এখানে বুড়াশিবের মন্দির ও রামচন্দ্রের মন্দির দ্রষ্টব্য বস্তু। বুড়াশিব নামে পরিচিত শিবলিঙ্গটি প্রায় ৯ ফুট উচ্চ। শিবরাত্রি, চড়ক ও ভৈমী একাদশীর সময় এখানে এখনও বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

মাজদিয়া স্টেশনের নিকটে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে মাথাভাঙ্গা নদী চূর্ণী ও ইছামতী ধারায় বিভক্ত হইয়াছে; চূর্ণী প্রধান লাইনের পশ্চিম দিয়া দক্ষিণে চলিয়া গিয়াছে। ইছামতী মাজদিয়া স্টেশনের দক্ষিণে প্রধান লাইনের নীচে দিয়া গিয়া নদীয়া, যশোহর, চব্বিশ পরগণা ও খুলনা জেলা দিয়া প্রবাহিতা হইয়াছে। ইহা একটি পুরাতন নদী; গঙ্গার প্রধান ধারা যখন ভাগীরথী পথে বহিত তখন ইহার উৎপত্তি হয় বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার কূলে স্থানে স্থানে পর্ত্তুগীজদিগের কুঠী স্থাপিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে ইহা ঢাকার পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মপুত্রে গিয়া পড়িত এবং এই সঙ্গমস্থলে বাংলার প্রাচীন রাজধানী রামপাল অবস্থিত ছিল। (পাবনা দ্রষ্টব্য)।

স্টেশনের দেড় মাইল দক্ষিণে **ভাজনঘাট** গ্রামে "রাই উন্মাদিনী" এবং "স্বপ্ন বিলাস" "বিচিত্র বিলাস" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা কবি কৃষ্ণকমল গোস্বামী মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বাল্যে পিতার সহিত বৃন্দাবনে থাকিয়া পড়াশুনা আরম্ভ করেন এবং নবদ্বীপে আসিয়া পাঠ সমাপ্ত করেন। কবি শেষ বয়সে ঢাকায় বাস করিতেন। ইহার রচিত যাত্রার পালা পূর্ব্ববঙ্গে অত্যন্ত লোকপ্রিয় হইয়াছিল। অনেকের মতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরে ইহার মত উচ্চদরের পদকর্ত্তা আর দৃষ্ট হয় না। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে চুঁচুড়ায় ইনি পরলোক গমন করেন।

মাজদিয়া স্টেশন হইতে এক মাইল পশ্চিমে কৃষ্ণগঞ্জ গ্রাম; তাহার পাশেই ক্ষুদ্র গ্রাম নাথপুরে সুপ্রসিদ্ধ কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাসের পৈতৃক বাসস্থান। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে রাণাঘাটে মাতুলালয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করায় গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া ১৭ বৎসর বয়সে খালাসির কার্য্য লইয়া তিনি বিলাত গমন করেন, তথায় নানা কষ্টের পর একটি সার্কাসদলে যোগ দিয়া শেষে দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রেজিলে উপস্থিত হন। সেখানে

অবস্থানকালে ঐ দেশীয় একটি চিকিৎসক-কন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং ব্রেজিলের সেনাদলে যোগদান করেন। নিজ কার্য্যকুশলতায় তিনি অচিরে লেফট্‌ন্যাণ্ট পদে উন্নীত হন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ব্রেজিলে রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ে তিনি সাধারণ তন্ত্রের পক্ষে বিশেষ সাহসের সহিত যুদ্ধ করেন। সেজন্য বিদেশী হইয়াও কর্ণেল পদ প্রাপ্ত হন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ২২এ সেপ্টেম্বর তিনি পরলোক গমন করেন। এখনও তাঁহার বংশীয়গণ ব্রেজিলে বাস করিতেছেন।

মাজদিয়া স্টেশন হইতে ২০ মাইল দূরবর্ত্তী কোটচাঁদপুর পর্য্যন্ত রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট একটি মোটরবাস সার্ভিস আছে। কোটচাঁদপুর যশোহর জেলার একটি বিখ্যাত বাণিজ্য-স্থান। এক সময়ে ইহা দেশী চিনির কারবারের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

বাণপুর—কলিকাতা হইতে ৬৯ মাইল দূর। এই স্থানের নিকটবর্ত্তী মাটীয়ারি গ্রামে কৃষ্ণনগর রাজবংশের প্রথম রাজধানী ছিল। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদারের পৌত্র রাঘব এই স্থান হইতে বর্ত্তমান কৃষ্ণনগরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। প্রাচীন রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ আজিও মাটিয়ারিতে দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, ভবানন্দ কাশীর অন্নপূর্ণামন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এখানে পীর মল্লিক গস্‌ নামক একজন মুসলমান সাধুর সমাধি আছে। অম্বুবাচীর সময় পীরের মৃত্যুতিথি উপলক্ষে এখানে একটি বৃহৎ মেলা হয়।

মাটীয়ারি অতি প্রাচীন গ্রাম। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে শ্রীমন্ত সদাগরের সিংহল যাত্রার প্রসঙ্গে এই গ্রামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

দর্শনা—কলিকাতা হইতে ৭৫ মাইল। সম্প্রতি এখানে একটি প্রকাণ্ড চিনির কল স্থাপিত হইয়াছে।

চুয়াডাঙ্গা—কলিকাতা হইতে ৮৪ মাইল দূর। স্টেশন হইতে চুয়াডাঙ্গা শহর প্রায় তিন মাইল দূর। ইহা নদীয়া জেলার একটি মহকুমা এবং ধান ও চাউলের একটি বিখ্যাত গঞ্জ। এই স্থান হইতে তুই মাইল পশ্চিমে উজিরপুর নামক গ্রামে একটি পুরাতন দীঘি ও অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

চুয়াডাঙ্গা স্টেশনে নামিয়া নদীয়া জেলার অন্যতম মহকুমা **মেহেরপুর** যাইতে হয়। চুয়াডাঙ্গা হইতে মেহেরপুর পশ্চিমদিকে অবস্থিত এবং মোটরবাস যোগে ১৮ মাইল দূর। স্টেশনের পশ্চিমে অল্প দূর যাইয়া মাথাভাঙ্গা নদী খেয়া নৌকায় পার হইতে হয়। ভৈরব নদের তীরে অবস্থিত মেহেরপুর একটি প্রাচীন স্থান। কেহ কেহ বলেন যে, এই স্থানে মিহির ও খনার বাস ছিল এবং মিহিরের নাম হইতেই নাকি মিহিরপুর বা মেহেরপুর নাম হইয়াছে। মেহেরপুরের দর্শনীয় স্থানের মধ্যে বলরাম হাড়ীর আখড়া ও গোয়াল চৌধুরীদিগের মন্দিরাদি প্রধান।

বলরাম হাড়ী "বলরামভজা" নামক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। এই সম্প্রদায় অনেকটা কর্ত্তভজা সম্প্রদায়ের অনুরূপ। এই সম্প্রদায়েও জাতিভেদ নাই। বলরামের শিষ্যগণ তাঁহাকে শ্রীরামচন্দ্রের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন। বলরাম প্রথম জীবনে জনৈক

ধনীর বাটীতে চৌকীদারের কার্য্য করিতেন। একবার মনিব কর্ত্তৃক চোর অপবাদ দেওয়ার ফলে তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া যোগ সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। সাধনাবলে তিনি অলৌকিক শক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার ভক্তগণের বিশ্বাস। প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে বলরামের মৃত্যু হয়। মেহেরপুরের নিকট ভৈরব নদের তীরে তাঁহার সমাধির উপর নির্ম্মিত মঠ বহু দূর হইতে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

চৌধুরী উপাধিধারী গোপজাতীয় জমিদারগণ এক সময়ে মেহেরপুরে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের দ্বারা নির্ম্মিত বহু মন্দিরের মধ্যে একটি শিব ও একটি কালী-মন্দির আজিও বর্ত্তমান আছে। কথিত আছে, বর্গির আক্রমণে বাধা দিতে গিয়া এই বংশ সপরিবারে ধ্বংস হয়। মেহেরপুরের মিউনিসিপ্যাল অফিস প্রভৃতি ইমারত গোয়াল চৌধুরীদিগের বাটীর ভগ্নস্তূপের ইষ্টকের দ্বারা নির্ম্মিত।

মেহেরপুরের রসকদম্ব ও ক্ষীরের মিঠাই প্রসিদ্ধ।

আলমডাঙ্গা—কলিকাতা হইতে ৯৪ মাইল দূর। ইহা নদীয়া জেলার একটি বিখ্যাত গঞ্জ। নদীয়া জেলার উত্তরে জলাঙ্গীর উৎপত্তির প্রায় ১০ মাইল পূর্ব্বদিকে পদ্মা হইতে বাহির হইয়া মাথাভাঙ্গা নদী আলমডাঙ্গা স্টেশনের প্রায় ৫ মাইল পশ্চিমে আসিয়া দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে ; কুমার নামে শাখাটি পূর্ব্বমুখে গিয়া আলমডাঙ্গা স্টেশনের কিছু উত্তরে লাইনের নীচে দিয়া গিয়া নদীয়া, যশোহর ও খুলনা জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। অপর শাখাটি মাথাভাঙ্গা নামেই লাইনের পশ্চিম দিয়া দক্ষিণে চলিয়া গিয়াছে। এককালে গঙ্গার প্রধান ধারা মাথাভাঙ্গা দিয়া বহিত। (পাবনা দ্রষ্টব্য।) আলমডাঙ্গার ৪ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে **গোস্বামী-দুর্গাপুর** নামক গ্রামে রাধারমণের একটি অতি পুরাতন মন্দির আছে। এখানে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথি হইতে এক পক্ষ স্থায়ী একটি বৃহৎ মেলা হয়। কথিত আছে, পূর্ব্বে এই স্থানে গভীর জঙ্গল ছিল এবং সেই জঙ্গলের মধ্যে কমলাকান্ত গোস্বামী নামে একজন সুদর্শন তরুণ সন্ন্যাসী বাস করিতেন। একদিন একদল দস্যু স্থানান্তরে দস্যুবৃত্তি করিয়া এই বনের মধ্যে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। দ্রুতগতিতে ছুটিয়া আসার জন্য তাহারা অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পড়ে এবং সম্মুখে সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার নিকট পানীয় জল চাহে। সন্ন্যাসী অদ্ভুত ক্ষমতাবলে স্বীয় ক্ষুদ্র কমণ্ডলু হইতে জল দিয়া সমগ্র দস্যুদলের পিপাসা নিবৃত্তি করেন। দস্যুদলের লুণ্ঠিত দ্রব্যের মধ্যে একটি রাধারমণ (কৃষ্ণ) বিগ্রহ ছিল। সন্ন্যাসীর অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহারা সেই বিগ্রহটি তাঁহাকে দান করে। সন্ন্যাসীও বিগ্রহটিকে যথাবিধি পূজা করিতে থাকেন। এই ঘটনার কিছুকাল পরে জয়দিয়ার রাজা মুকুটরায় স্বীয় তরুণী কন্যা দুর্গাবতীকে সঙ্গে লইয়া শিকারে বহির্গত হন এবং এই অরণ্য মধ্যে সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পান। তরুণ সন্ন্যাসীর সুন্দর মূর্ত্তি ও গাম্ভীর্য্য দর্শনে রাজা বিশেষ মুগ্ধ হন এবং রাজকন্যা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। সন্ন্যাসীও রাজকন্যার রূপ দর্শনে প্রীতি-লাভ করেন। রাজা উভয়ের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদের বিবাহের আয়োজন করেন এবং এই অরণ্যমধ্যে একটি সুন্দর নগর নির্ম্মাণ করিয়া উহার নাম দেন গোস্বামী-দুর্গাপুর। গোস্বামী-দুর্গাপুরের বর্ত্তমান মন্দিরে যে শিলালিপি আছে তাহা হইতে জানা

যায় যে জয়দিয়ার রাজা মুকুটরায়ের পুত্র শ্রীকৃষ্ণরায় ১৫৯৬ শকাব্দে (১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে) রাধারমণের জন্য এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। জয়দিয়া গোস্বামী-দুর্গাপুর হইতে ২৮ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত এবং বর্ত্তমানে ইহা যশোহর জেলার অন্তর্গত একটি গণ্ডগ্রাম মাত্র।

পোড়াদহ জংশন—কলিকাতা হইতে ১০৩ মাইল দূর। এই স্থানও নদীয়া জেলার একটি বাণিজ্যকেন্দ্র। এখান হইতে পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের একটি শাখা লাইন ৫৪ মাইল দূরবর্ত্তী গোয়ালন্দে একেবারে পদ্মার ধার পর্য্যন্ত গিয়াছে। কলিকাতা হইতে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত সরাসরি গাড়ী যাতায়াত করে। এই শাখাপথে অবস্থিত কালুখালি জংশন ও পাঁচুরিয়া জংশন হইতে দুইটি শাখা যথাক্রমে ভাটিয়াপাড়া ঘাট ও ফরিদপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে।

কুষ্টিয়া—কলিকাতা হইতে ১১১ মাইল দূর। ইহা নদীয়া জেলার একটি মহকুমা। শহরটি গড়াই নদীর তীরে অবস্থিত ও একটি বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র। গড়াই নদী কুষ্টিয়ার অনতিদূরে পদ্মা হইতে উঠিয়াছে এবং দক্ষিণে যশোহর ও ফরিদপুর জেলার সীমা দিয়া গিয়া খুলনা জেলায় প্রবেশ করিয়া এই জেলা এবং বাখরগঞ্জ জেলার সীমা রক্ষা করিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। দক্ষিণে ইহা মধুমতী, বলেশ্বর এবং হরিণঘাটা নামে পরিচিত। এককালে গঙ্গার প্রধান ধারা গড়াই নদী দিয়া বহিত। কুষ্টিয়ার প্রায় দুই মাইল পূর্ব্বে গড়াই নদীর উপর একটি বড় সেতু আছে। সম্প্রতি ইহা নূতন করিয়া



গড়াই নদীর সেতু, কুষ্টিয়া

নির্ম্মিত হইয়াছে। কুষ্টিয়া শহরে মোহিনী মিল নামক বিখ্যাত কাপড়ের কল অবস্থিত। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে খৃষ্টান মিশনারীগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটি গির্জ্জা ও তৎসংলগ্ন সমাধিক্ষেত্র এখানকার অন্যতম দ্রষ্টব্য। কুষ্টিয়ায় ধান, চাউল, দাইল-কলাই, গুড় ও পাটের বিস্তৃত কারবার আছে। কুষ্টিয়ার নিকটবর্ত্তী লাহিনীপাড়া গ্রাম সুবিখ্যাত "বিষাদসিন্ধু" প্রণেতা মরহুম মীর মশারফ হোসেন সাহেবের জন্মস্থান।

কুমারখালি- কলিকাতা হইতে ১১৯ মাইল দূর। ইহাও গড়াই নদীর তীরে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ স্থান। ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে এখানে একটি রেশম কুঠি ছিল। এই সময়ে নির্ম্মিত একটি কারখানা এখনও এখানে আছে। সেই সময়কার সাক্ষীস্বরূপ এখনও একটি ছোট গোরস্থান বর্ত্তমান আছে। কুমারখালি পূর্ব্বে পাবনা

জেলার অধীন ছিল এবং এখানে একটি মুনসেফী আদালত ছিল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ইহা নদীয়া জেলার অধীন হওয়ার পর এই আদালত উঠিয়া যায়। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ হইতে এখানে একটি মিউনিসিপ্যালিটি আছে।

কুমারখালি প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও সাধক হরিনাথ মজুমদার বা কাঙাল হরিনাথের জন্মস্থান। কাঙাল হরিনাথের রচিত বাউলের গানগুলি এখনও জনসমাজে বিশেষ সমাদৃত। কাঙাল হরিনাথের সাহিত্যশিষ্য সম্প্রতি পরলোকগত স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক রায় জলধর সেন বাহাদুরও কুমারখালির অধিবাসী ছিলেন।

কুমারখালি স্টেশন হইতে প্রায় ৫ মাইল দূরে পদ্মা ও গড়াই নদীর সঙ্গমস্থলের অতি নিকটে পদ্মার তীরে **শিলাইদহ** গ্রাম অবস্থিত। রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে এই গ্রাম বাংলাসাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে। এই স্থানে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরদিগের একটি বড় কাছারি আছে। জমিদারীর কার্য্য দেখিবার জন্য কবি রবীন্দ্রনাথ বহু সময় এই গ্রামে অবস্থান করিয়াছেন। তাঁহার বহু কবিতা ও অন্যান্য রচনা এই শিলাইদহে বসিয়া লেখা। বাংলা সাহিত্যানুরাগীদিগের নিকট এই গ্রাম একটি ক্ষুদ্র তীর্থস্বরূপ। অনেকেই রবীন্দ্রনাথকে অদ্বিতীয় কবি ও আদর্শবাদী বলিয়া জানেন, কিন্তু তিনি যেরূপ দক্ষতা ও ঔদার্য্যের সহিত জমিদারীর কাজ চালাইয়াছেন তাহা শুনিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে ব্যবহারিক জীবনে তিনি কবিসুলভ অক্ষমতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাঁহার প্রতিভা যথার্থই বহুমুখী।

শিলাইদহে গোপীনাথদেবের বিগ্রহ বিরাজিত। স্নানযাত্রা উপলক্ষে এই স্থানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। এই স্থানটির প্রাকৃতিক দৃশ্যও অতি সুন্দর।

পাংশা—কলিকাতা হইতে ১৩১ মাইল দূরবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র স্টেশন। ইহা ফরিদপুরের অন্তর্গত। স্টেশনের ৩ মাইল দক্ষিণে মালঞ্চি গ্রামে একটি সুবিস্তৃত ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহা রাজা সীতারাম রায়ের গড় ছিল বলিয়া কথিত। পাংশার পূর্ব্বদিকে কালিকাপুরেও তাঁহার একটি গড় ছিল এবং ইহার নিকটে নবাব সৈন্যের সহিত তাঁহার একটি খণ্ডযুদ্ধ হইয়াছিল।

কালুখালি জংশন—কলিকাতা হইতে ১৩৬ মাইল দূর। কয়েক বৎসর হইল এখান হইতে ৪২ মাইল দূরবর্ত্তী **ভাটিয়াপাড়া ঘাট** পর্য্যন্ত একটি শাখা লাইন খোলা হইয়াছে। এই শাখাপথের **মধুখালি জংশন** হইতে অপর একটি শাখা ৭ মাইল দূরবর্ত্তী **কামারখালি ঘাট** পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই শাখাপথ দিয়া প্রচুর পরিমাণে পাটের আমদানি হয়।

এই শাখায় কালুখালি জংশন হইতে ৬ মাইল দূর **রামদিয়া** স্টেশন হইতে ২ মাইল পূর্ব্বদিকে খালকুলা গ্রাম প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও লেখক ৺বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের জন্মস্থান। শতানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের বংশীয় এই গ্রামের জ্যোতির্ব্বিদগণ এককালে প্রসিদ্ধ ছিলেন। রামদিয়া স্টেশন হইতে চন্দনা নদী পার হইয়া ১ মাইল দক্ষিণে দক্ষিণবাড়ী গ্রামে এতদঞ্চলে প্রসিদ্ধ পীর মনুমিঞা ও সনুমিঞার সমাধিস্থানে

হিন্দুমুসলমান নির্ব্বিশেষে ভক্তি প্রদর্শন করেন। দক্ষিণবাড়ীর নিকটস্থ শেখ-আড়া গ্রামে পীর শাহ পালোয়ানের সমাধি আছে। ইহার সম্বন্ধে নানা অলৌকিক ক্ষমতার কাহিনী প্রচলিত আছে। কথিত আছে, ইনি মৃত্যুর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন তাহার কবর পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ করিয়া দিতে। কিন্তু উহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া সাধারণ নিয়মানুসারে উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ করিয়া সমাধি দেওয়া হয়। কিন্তু পরদিন প্রাতে দেখা যায় সমাধি ঘুরিয়া পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ হইয়াছে।

কালুখালি জংশন হইতে **বহরপুর** স্টেশন ৯ মাইল দূর; স্টেশনের ৩ মাইল পূর্ব্ব-দিকে বাণীবহ নামে একটি পুরাতন ও প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে। কথিত আছে সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের সময়ে সংগ্রামশাহ নামক একজন রাজপুতসেনা-নায়ক পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি জলদস্যু দমনের জন্য পদ্মা ও মেঘনার সঙ্গমস্থলে নূতন নাওয়ারা মহলের কর্ত্তা হইয়া আসেন। নাওয়ারা মহলের খরচের জন্য এবং পারিশ্রমিক হিসাবে বহু সম্পত্তি তিনি পাইয়াছিলেন। তিনি এদেশেই বিবাহ করিয়া থাকিয়া যান এবং তাঁহার বংশীয়গণ উত্তরাধিকারক্রমে নাওয়ারা মহলের কর্ত্তৃত্ব করিতেন। ইহারাই বাণীবহের নাওয়ারা চৌধুরী নামে পরিচিত হন। ইহারা একটি পুরাতন জমিদার বংশ। রাজা সীতারাম রায় নাওয়ারার বহু সম্পত্তি দখল করিয়া লইয়াছিলেন।

কালুখালি জংশন হইতে **আড়কান্দী** স্টেশন ১২ মাইল দূর। এইখানে চন্দনা নদীতীরে বাণীবহের "নাওয়ারা" চৌধুরীদের নৌকা নির্ম্মাণের প্রধান কারখানা ছিল।

কালুখালি জংশন হইতে প্রায় ১৬ মাইল দূরবর্ত্তী **নলিয়া গ্রাম** স্টেশন। নলিয়াতে মাঘীপূর্ণিমার সময়ে একটি মেলা হয়। এই মেলায় লোক-শিল্পের নিদর্শনস্বরূপ কিছু কিছু দ্রব্য বিক্রীত হয়।

কালুখালি জংশন হইতে **মধুখালি জংশন** ২০ মাইল দূর; স্টেশন হইতে ২ মাইল পশ্চিমে কোঁড়কদি এককালে পণ্ডিত প্রধান গ্রাম ছিল; এখানকার নৈয়ায়িক রামধন তর্কপঞ্চাননের খ্যাতি পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র বিস্তৃত ছিল। কোঁড়কদির সান্যালদিগের বাড়ীতে একবার একই রাত্রে ১০১ খানি কালীপূজা হইয়াছিল বলিয়া কথিত; ইহা হইতে গ্রামটির পুরাতন সমৃদ্ধির কথা জানা যায়। মধুখালি জংশন হইতে পশ্চিমে প্রায় ৭ মাইল দূরে চন্দনা ও গড়াই নদীর সঙ্গমস্থলে **কামারখালি ঘাট** পর্য্যন্ত একটি শাখা লাইন গিয়াছে। মধুখালি ও কামারখালিঘাট এই অঞ্চলের বাণিজ্যপ্রধান স্থান।

কালুখালি জংশন হইতে **বোয়ালমারি বাজার** স্টেশন ৩১ মাইল; বারসিয়া নদীর উপর ইহা একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র। ইহার আধ মাইল পশ্চিমে ভূষণা থানা। ইহা একটি প্রাচীন ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। ভূষণার অধিপতি মুকুন্দরাম বারভূঁইয়া-দিগের অন্যতম ছিলেন। সম্রাট আকবরের রাজত্বের শেষদিকে অন্যান্য ভূঁইয়াদিগের সহিত ইনিও বিদ্রোহী হন। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সময়ে নবাব ইসমাইল খাঁ ভূষণাধিপতি মুকুন্দরামের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া তাঁহার সাহায্যে কোচহাজো বা কামরূপ অধিকার করেন। ইহার পুত্র সত্রাজিতের কথা খুলনা বাগেরহাটের পর সত্রাজিৎপুর প্রসঙ্গে বলা

হইয়াছে। বহু কাল হইতে ভূষণার বিবিধ প্রকারের সূক্ষ্ম বস্ত্র, কাগজ, গালা, মোম, তামা, পিতলকাঁসা প্রভৃতির দ্রব্যাদি এবং সোনারূপার কারুশিল্পের খ্যাতি ছিল। প্রাকারবেষ্টিত প্রাচীন ভূষণার জঙ্গলাকীর্ণ ভগ্নাবশেষের মধ্যে নানাস্থান বিভিন্ন বাজার নামে অভিহিত হয়। গোপীনাথজীউর আখড়া ও রণরঙ্গিণী দেবীর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। ভূষণার খাসা নামক বস্ত্র বহুকাল হইতে খ্যাত। রামপ্রসাদের "বিদ্যাসুন্দরে" আছে।

বনাত মখ্‌মল পট্টু ভূষণাই খাসা,
বুটাদার ঢাকাইয়া দেখিতে তামাসা।

এককালে ভূষণা এঅঞ্চলে সভ্যতা ও বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। রাজা সীতারাম রায়ের উত্থানের সহিত ভূষণার বাণিজ্য ক্রমে মহম্মদপুরে চলিয়া যায় এবং ভূষণার পতন সুরু হয়। বোয়ালমারি বাজার স্টেশন হইতে পশ্চিমে বারাসিয়া ও গড়াইনদী পার হইয়া ৬ মাইল দূরে সীতারামের প্রাচীন রাজধানী মহম্মদপুর অবস্থিত। ("মহম্মদপুর" দ্রষ্টব্য)।

কালুখালি জংশন হইতে **ব্যাসপুর** স্টেশন প্রায় ৪১ মাইল দূর। স্টেশনের একটু উত্তরে কারণ্যপুর নামে ক্ষুদ্র একটি গ্রাম আছে; ইহা ক্ষুদ্র হইলেও বাঙ্গালীর নিকট পরিচিত হইবার দাবী রাখে। সুপ্রসিদ্ধ জননায়ক ও বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রামের প্রসিদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায়বংশ হইতে উদ্ভূত। ব্যাসপুর স্টেশন হইতে প্রায় ৬ মাইল পূর্ব্বদিকে মুকসুদপুর থানার অন্তর্গত খান্দারপাড়া একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এই গ্রামটি রামচন্দ্রপুর নামেও অভিহিত হয়। রজনীকান্ত স্মৃতিভূষণ, বিষ্ণুরাম কবিরাজ-চন্দ্র প্রভৃতি বহু পণ্ডিত এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কবিরাজ চন্দ্র মহাশয় কালিদাসের শৃঙ্গারতিলক কাব্যের নূতন এক ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। খান্দারপাড়ের সেন কবিরাজবংশে বহু চিকিৎসক জন্মিয়াছেন; ইহাদের মধ্যে অভিরাম কবিরাজ মহাশয়ের "খান্দারপাড় সংগ্রহ" একখানি প্রসিদ্ধ চিকিৎসা গ্রন্থ সংগ্রহ। ইনি রাজা সীতারাম রায়ের সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইহারা বহু পুরুষ ধরিয়া সংস্কৃত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য টোল চালাইয়াছিলেন। এইজন্য গ্রামটি সাধারণ্যে টোলা রামচন্দ্রপুর নামে অভিহিত হইত। সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ৺দ্বারিকনাথ সেন এই বংশের লোক ছিলেন। ভারতীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে পণ্ডিত দ্বারিকানাথ সেন কবিরত্ন মহাশয়ই প্রথম মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত হন।

এই শাখা লাইনের শেষ স্টেশন **ভাটিয়াপাড়া ঘাট** কালুখালি জংশন হইতে ৪২ মাইল দূর। ইহা বারাসিয়া ও মধুমতী নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত একটি বাণিজ্য প্রধান-স্থান। স্টেশন হইতে মধুমতী পার হইয়া প্রায় ৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে যশোহর জেলার অন্তর্গত লোহাগড়া গ্রামে ২০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে চন্দ্রশেখর মজুমদার মহাশয় একটি সুন্দর কারুকার্য্যখচিত জোড়বাংলা স্থাপন করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় সুদূর পল্লীগ্রামে এই মন্দির ইংরেজ অধিকারের বহু পূর্ব্বে নিৰ্ম্মিত হইলেও ইহার তিনটি খিলানে ইংরেজের জাতীয় রাজচিহ্ন উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। যশোহরের সুসন্তান ৺রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার এই গ্রামে চন্দ্রশেখর মজুমদার মহাশয়ের বংশে জন্মলাভ করেন।

ভাটিয়াপাড়া ঘাট হইতে ৩।৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে মধুমতী পার হইয়া যশোর জেলার অন্তর্গত ইত্না একটি প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রামের রায় বংশের পূর্ব্বপুরুষ পরমানন্দ রায় ভূষণাধিপতি মুকুন্দরামের একজন সেনাপতি ছিলেন। ইহার পত্নী একটি অপূর্ব্ব কারুকার্য্যখচিত মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি ঘোষবংশের কন্যা বলিয়া মঠটি "ঘোষ-দুহিতার মঠ" নামে পরিচিত। মঠের ইষ্টকলিপি হইতে জানা যায় যে ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে "জগৎগুরু" শ্রীপতি নারায়ণের পরিতোষের জন্য ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাজবাড়ী—কলিকাতা হইতে ১৪৬ মাইল দূর। গোয়ালন্দ মহকুমার সদর দপ্তর রাজবাড়ীতে অবস্থিত। স্টেশন হইতে ৪।৫ মাইল দক্ষিণে হুমদমপুর একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রাম। ইহার এক অংশ মূলঘর নামে পরিচিত। এখানে প্রসিদ্ধ সরযূপারী-গ্রহবিপ্রবংশীয় আচার্য্যদিগের বাটীতে স্ফটিকনির্ম্মিত অতি মনোরম সূর্য্যমূর্ত্তি ও দামোদর নামক নারায়ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই বিগ্রহের সেবার জন্য পূর্ব্বে রাজা সীতারাম রায় ও নাটোর জমিদারগণ ভূমি দান করিয়াছিলেন। মূলঘরে পূর্ব্বে সংস্কৃত চর্চ্চা ছিল। কথিত আছে রাজা সীতারামের সময়ে সরযূপারী গ্রহবিপ্রগণ প্রথম এঅঞ্চলে আগমন করেন। ইহারা জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। হুমদমপুরের এক মাইল পশ্চিমে পাঁচথুপিও একটি প্রাচীন গ্রাম। পূর্ব্বে পাঁচথুপির কাছ দিয়া পদ্মা বহিত; এখনও মরাপদ্মার চিহ্ন নিকটে কিছু কিছু দৃষ্ট হয়। পাঁচথুপির উত্তরে রাধাগঞ্জ নামে তখন একটি বড় বন্দর ছিল এবং তথা হইতে মুঘল সৈন্যের যাতায়াতের জন্য রাজাপুর পর্য্যন্ত একটি চওড়া রাস্তা ছিল। উহা পল্টনের রাস্তা নামে অভিহিত হইত। বাণীবহের নাওয়ারা চৌধুরী-গণের আদিবাস পাঁচথুপিতে ছিল; তথা হইতে তাঁহারা বাণীবহে উঠিয়া যান।

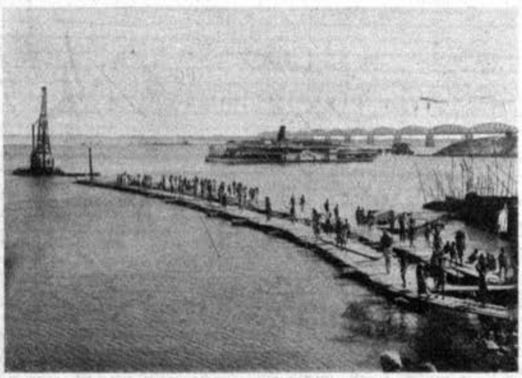
পাঁচুরিয়া জংশন—কলিকাতা হইতে ১৫১ মাইল দূর। এখান হইতে একটি শাখা লাইন ১৫ মাইল দূরবর্ত্তী **ফরিদপুর** পর্য্যন্ত গিয়াছে।

ফরিদপুর—কলিকাতা হইতে ১৬৬ মাইল দূর। জেলার সদর শহর ফরিদপুর মরাপদ্মা নামে একটি খালের উপর অবস্থিত। ইহার পূর্ব্ব দিকে মাদারতলা খাল ও পশ্চিমে ফরিদপুরের জোলা নামে আরও দুইটি খাল আছে। শহরের দক্ষিণ দিকে ঢোল সমুদ্র নামে একটি প্রকাণ্ড বিল আছে। বর্ষাকালে এই বিলের জল শহরের প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছে। ফরিদ খাঁ নামক এক ফকিরের নাম হইতে ফরিদপুরের নামকরণ হইয়াছে বলিয়া কথিত। ফরিদখাঁর দরগাহ কাছারীর উত্তরে দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে এই শহরের কমলাপুরপাড়ার উত্তর পশ্চিমে পদ্মা বহিত এবং তাহার নিকটে বনমধ্যে একটি ডাকাতের দলের আড্ডা ছিল। ইহার নেতৃত্ব করিত ছবদরা নামে একটি স্ত্রীলোক; এই ডাকাতের দল দমন করিবার জন্য প্রথমে এখানে মহকুমার প্রতিষ্ঠা হয়, এবং পরে ইহা জেলার সদরে পরিণত হইয়াছে।

ফরিদপুরে রাজেন্দ্র কলেজ নামে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ আছে। পরলোক-গত বিখ্যাত জননায়ক অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় ফরিদপুরের অধিবাসী ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল পুরাতন ফরিদপুর স্টেশনটির নাম পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার

নামানুসারে অম্বিকাপুর রাখা হইয়াছে এবং রেল লাইনকে বিস্তৃত করিয়া বর্ত্তমান ফরিদপুর স্টেশনের সৃষ্টি হইয়াছে। ফরিদপুরে জগদ্বন্ধু সুন্দর নামে একজন ভক্ত সাধক বাস করিতেন। তাঁহার সমাধি এখানকার একটি দ্রষ্টব্য বস্তু।

গোয়ালন্দ—কলিকাতা হইতে ১৫৫ মাইল দূর। এই স্থানটি প্রবলস্রোতা পদ্মার তীরে অবস্থিত। পদ্মার ভাঙ্গনের জন্য শহর ও স্টেশন এক জায়গায় থাকিতে পারে না, প্রায়ই বৎসর বৎসর ইহার স্থান পরিবর্ত্তন করিতে হয়। এই জন্য এখানে ছোট ছোট কুটীর ভিন্ন বড় বাড়ী নিৰ্ম্মিত হয় না। রেল স্টেশনের অফিস প্রভৃতি পদ্মার মধ্যে ভাসমান ফ্ল্যাটের উপর অবস্থিত। গোয়ালন্দ হইতে স্টীমার যোগে পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের ঢাকা বিভাগের নারায়ণগঞ্জ স্টেশন ও আসাম বাংলা রেলপথের চাঁদপুর এবং বাংলার আরও বহু স্থানে যাওয়া যায়। গোয়ালন্দ হইতে সিরাজগঞ্জ ঘাট ও জগন্নাথগঞ্জ ঘাট হইয়া বাহাদুরাবাদ ঘাট পর্য্যন্ত দৈনিক স্টীমার যাতায়াত করে। গোয়ালন্দের ইলিশ মাছ ও তরমুজ খুব বিখ্যাত। বর্ষাকালে গোয়ালন্দ হইতে বহু পরিমাণে ইলিশ মাছ কলিকাতায় চালান আসে। গোয়ালন্দের নিকটবর্ত্তী পদ্মানদীর বাঁক সমূহে যত ইলিশ মাছ পড়ে, এত আর কোথাও দেখা যায় না। বর্ষাকালে ইলিশ মাছ ধরিবার জন্য এক এক স্থানে বহু জেলের নৌকার সমাবেশ হয় এবং কেবলমাত্র জেলেদের ও মহাজনদের নিকট জিনিষ পত্র বিক্রয় করিবার জন্য নিকটবর্ত্তী চর গুলিতে অস্থায়ীভাবে এক একটি বড় বাজার বসে। গোয়ালন্দের নিকটস্থ পদ্মাতীরবর্ত্তী স্থান সমূহের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর।



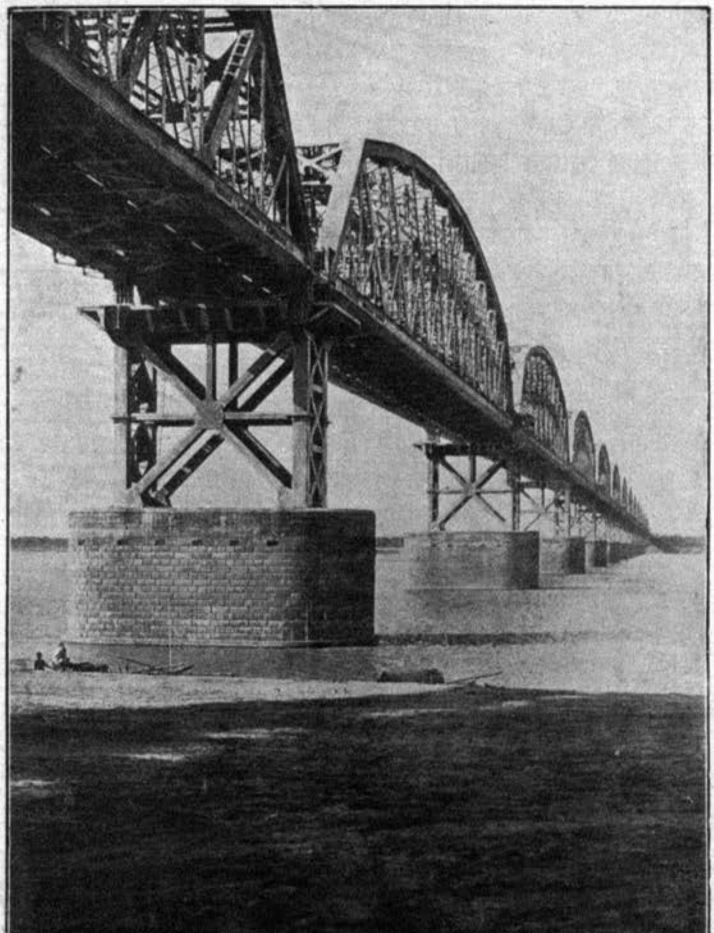
হার্ডিং সেতু সংরক্ষণের বাঁধ

ভেড়ামারা জংশন—কলিকাতা হইতে ১১৫ মাইল দূর। ইহা একটি বর্দ্ধিষ্ণু পল্লী। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল এখানে "সর্ব্বানন্দ মঠ" নামে একটি মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই মঠের সংলগ্ন একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় আছে।

ভেড়ামারা হইতে একটি শাখা লাইন দামুকদিয়া হইয়া ৯ মাইল দূরবর্ত্তী **রায়তা** পর্য্যন্ত গিয়াছে। জগদ্বিখ্যাত হার্ডিং সেতু নিৰ্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে দামুকদিয়া ঘাট হইতে

খেয়া জাহাজ-যোগে যাত্রীদিগকে পদ্মা পার হইয়া সাঁড়া ঘাট স্টেশনে মাঝারি মাপের ট্রেণ ধরিতে হইত।

ভেড়ামারা স্টেশন অতিক্রম করিবার পর রেলের লাইন ক্রমশঃ উচু হইতে আরম্ভ করিয়াছে, লাইনের দুইদিকে বিল ও পদ্মা নদীর বিস্তৃত চরভূমির দৃশ্য। ইহার পর



হার্ডিং সেতু

সুপ্রসিদ্ধ **হার্ডিং সেতু**। এই সেতু ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়। তৎকালীন বড়লাট লর্ড হার্ডিংএর নামানুসারে ইহার নাম হয় "হার্ডিং সেতু"। ইহা পৃথিবীর দীর্ঘ রেলওয়ে সেতুগুলির অন্যতম। ইহার দৈর্ঘ্য ৫,৯০০ ফুট। পদ্মানদী প্রায়ই গতি পরিবর্ত্তন করে ও অনেক সময়ে অন্তঃসলিলারূপে প্রবাহিত হয়। এরূপ

চঞ্চল জলস্রোত পৃথিবীতে অতি অল্পই আছে। সুতরাং এই সেতু নির্ম্মাণ করিতে বিশেষ বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হইয়াছিল। পদ্মার প্রবল স্রোতে স্তম্ভগুলি যাহাতে অবিচলিত থাকিতে পারে তজ্জন্য ইহাদের কোন কোনটিকে নদীতল হইতে প্রায় ১৫০ ফুট নীচু হইতে গাঁথিয়া তোলা হইয়াছে। এই সেতু সংরক্ষণের জন্য পদ্মার উভয় তীর দিয়া প্রকাণ্ড পাথরের বাঁধ দিতে হইয়াছে এবং জলস্রোতের বেগ সংহত করিবার জন্য বহু পাশখাল খনন ও জলমধ্যে "পিরামিড" নির্ম্মাণের প্রয়োজন হইয়াছে। ভারতের প্রধান প্রধান ইঞ্জিনীয়রগণকে লইয়া গঠিত একটি সমিতির পরামর্শক্রমে এই সেতু সংরক্ষণ করা হয়। এই সেতুটি সমগ্র জগতের মধ্যে স্থপতিবিদ্যার একটি অপূর্ব্ব কীর্ত্তিস্বরূপ পরিগণিত। সেতুর উপরে লোক চলাচলের পথ আছে। সেতুর উপর হইতে পদ্মানদীর দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। বর্ষাকালে যখন গৈরিক জলস্রোতসম্ভারে পদ্মার কলেবর অতিশয় পরিপুষ্ট হয়, তখনকার দৃশ্য যেরূপ ভীষণ সেইরূপই সুন্দর। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তখন "কূল ছাড়ি নদী কলকল্লোলে এল পল্লীর কাছে রে।" এই বিপুল জলরাশির উপর দিয়া হলদে ও কমলালেবু রঙের পাল তোলা নৌকাগুলির সহজ ও স্বচ্ছন্দ গতিতে ভাসিয়া যাওয়ার দৃশ্য অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয়।

যাঁহারা এই সেতু দেখিতে চান তাঁহাদিগের পক্ষে ভেড়ামারার পরবর্ত্তী স্টেশন পাক্‌শীতে নামাই সুবিধা। পাক্‌শী স্টেশন এই সেতুর ঠিক পার্শ্বেই অবস্থিত। পাক্‌শী হইতেই পাবনা জেলার সীমানা আরম্ভ। পদ্মাতীরবর্ত্তী স্থানগুলি বিশেষ স্বাস্থ্যকর। পাক্‌শীতে পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের বিভাগীয় দপ্তর অবস্থিত এবং ইহা একটি প্রসিদ্ধ রেলওয়ে বসতি; এই বসতিতে যাইবার সুবিধার জন্য পরবর্ত্তী স্টেশন ঈশ্বরদি হইতে একটি সাইডিং আছে।

ঈশ্বরদি জংশন—কলিকাতা হইতে ১২৫ মাইল দূর। ইহা পূর্ব্বে একটি ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রাম ছিল, কিন্তু রেলের কল্যাণে বর্ত্তমানে একটি বৃহৎ বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। ঈশ্বরদি হইতে ২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে **সাঁড়া** গ্রাম। হার্ডিং সেতু নির্ম্মাণের পূর্ব্বে ইহা পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের একটি প্রধান ঘাট স্টেশন ছিল। এখন মালগুদামের জন্য ঈশ্বরদি হইতে একটি সাইডিং আছে। বিহার হইতে আগত কয়েকটি পরিবার এখানে একপ্রকার মোটা কম্বল তৈয়ারী করে; পশমের জন্য ইহারা ভেড়া পুষিয়া থাকে। ঈশ্বরদি হইতে জেলার সদর শহর ১৮ মাইল দূরবর্ত্তী **পাবনা** পর্য্যন্ত রেলওয়ে-সংশ্লিষ্ট মোটরবাস যাতায়াত করে। পাবনা শহর ইছামতী নদীর তীরে অবস্থিত এবং ইহার প্রায় দুই মাইল দক্ষিণে গঙ্গা বা পদ্মা প্রবাহিতা। পদ্মার ভাঙ্গনের জন্য শহর রক্ষা করা অনেকবার উদ্বেগের কারণ হইয়াছে। চার শত বৎসর পূর্ব্বেও গঙ্গা এই পথে বহিত না; ইহার প্রধান ধারা তখন ভাগীরথী দিয়াই চলিত, কিন্তু পলি পড়িয়া নদীতল উচ্চ হইয়া উঠিলে পর পর জলঙ্গী, মাথাভাঙ্গা, গড়াই প্রভৃতি দিয়া গঙ্গার প্রধান প্রবাহ বহিতে থাকে; এই রূপে নদী ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে চলিতে চলিতে বর্ত্তমান পদ্মার খাত খুঁজিয়া লয়। এইরূপ অনুমিত হয় যে গঙ্গার ক্রমশঃ পূর্ব্ব দিকে গমনের সহিত উত্তরে কোশী নদীর পশ্চিমাভিমুখে গমনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। পূর্ব্বে কোশী মহানন্দার সহিত মিলিত হইয়া দক্ষিণ-পূর্ব্বে বহিয়া ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইত। পরে ইহারা গঙ্গার সহিত যুক্ত হয় এবং কোশী ক্রমশঃই

পশ্চিম দিকে হটিতে থাকে। ইছামতী পাবনার ঠিক নীচেই পদ্মা হইতে উঠিয়া জেলার দক্ষিণ দিকে বহিয়া বেরার নিকট হুরাসাগর নদীতে পড়িয়াছে। ইছামতী নামে নদী নদীয়া, যশোহর, খুলনা, চব্বিশ পরগণা, ঢাকা প্রভৃতি জেলায় দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ পূর্ব্বে এগুলি একই নদী ছিল।

পাবনা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন পূর্ব্বকালে এখানে "পবনা" নামে একজন দস্যুর আড্ডা ছিল, তাহার নাম হইতেই পাবনা নাম হইয়াছে। আবার কাহারও কাহারও মতে গঙ্গার পাবনী নামক পূর্ব্বগামিনী ধারা হইতেই "পাবনা" নাম হইয়াছে। পাবনা ছোট শহর। এখানে বহু পরিমাণে গেঞ্জী মোজা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। এখানে এড্ওয়ার্ড কলেজ নামক একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ, একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও একটি টেক্নিক্যাল স্কুল আছে। এখানকার প্রাচীন কীর্ত্তির মধ্যে জোড়-বাংলা উল্লেখযোগ্য। ইহা শহরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে কালাচাঁদপাড়ায় অবস্থিত। এই মন্দিরের উপরিভাগ অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল প্রস্তর দিয়া মন্দিরটি নির্ম্মিত; ইহার প্রাচীরগাত্রে বহু দেবদেবীর চিত্র উৎকীর্ণ আছে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের প্রবল ভূমিকম্পের ফলে এই মন্দিরের পাদপীঠ অনেকটা মৃত্তিকাগর্ভে বসিয়া গিয়াছে। কথিত আছে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রজমোহন ক্রোড়ী (ক্রোড় সংখ্যক দাম রাজস্ব আদায়কারী) নামক জনৈক ব্যক্তি কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হয়। পাবনা শহরের অনতিদূরে হিমাইতপুর গ্রামে "সৎসঙ্গ" নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। এখানে ধর্ম্ম শিক্ষার সহিত হাতে কলমে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও কুটীর শিল্প প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুর অনুকূলের জন্মোৎসব উপলক্ষে এখানে বহু লোকের সমাগম হয়। এখানে একটি অতিথিশালা আছে। পাবনা শহরের ১২ মাইল পূর্ব্বদিকে তাঁতীবন্দের চৌধুরী বংশীয় জমিদারগণ এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ।

ঈশ্বরদি জংশন হইতে একটি শাখা লাইন ৫০ মাইল দূরবর্ত্তী সিরাজগঞ্জ ঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছে। বর্ত্তমানে আসাম বাংলা রেলপথের আশুগঞ্জ ও ভৈরববাজারের মধ্যে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্ম্মিত হওয়ায় সিরাজগঞ্জ ঘাট, জগন্নাথগঞ্জ ঘাট ও ময়মনসিংহ হইয়া অল্প সময়ে কলিকাতা ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

এই শাখা পথে চাটমোহর, ভাঙ্গুড়া, উল্লাপাড়া ও সিরাজগঞ্জ (বাজার ও ঘাট) উল্লেখযোগ্য স্টেশন।

চাটমোহর—ঈশ্বরদি হইতে চাটমোহর ১৬ মাইল দূর। ইহা বড়াল নদীর তীরে অবস্থিত এবং পাবনা জেলার একটি বাণিজ্য-কেন্দ্র। বড়াল রাজশাহী জেলার চারঘাটের নিকটে পদ্মা হইতে উঠিয়া শাহজাদপুরের দক্ষিণে হুরাসাগরে পতিত হইয়াছে। চাটমোহরে একটি প্রাচীন মস্জিদ আছে। এই মস্জিদের উৎকীর্ণলিপি হইতে জানা যায় যে ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে তুই মহম্মদ খাঁ কাক্শালের পুত্র সুলতান মাসুম খাঁ কাবুলি কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হয়। এই মস্জিদের প্রস্তর গাত্রে বহু হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত আছে। তুর্কি জাতির এক শাখা কাক্শাল নামে পরিচিত ছিল। উত্তর বঙ্গে বিশেষতঃ দিনাজপুর জেলায় ইহাদের বহু জায়গীর ছিল। নিষ্কর জায়গীর উঠাইয়া লওয়ায় এবং ইসলাম ধর্ম্মের উপর সম্রাট আকবরের তাদৃশ নিষ্ঠা ছিল না মনে করিয়া

কাক্‌শালগণ তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহে মাসুম খাঁ নেতৃত্ব করেন। বাদশাহী সেনাদলকে ইহাতে বেশ বেগ পাইতে হইয়াছিল। পরে মাসুম খাঁ কাবুলি সোণার গাঁ-এর ঈশা খাঁর সহিত যোগদান করেন; কিন্তু অবশেষে ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে ভাওয়ালের নিকট বাদশাহী ফৌজের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। কথিত আছে মাসুম খাঁ চাটমোহরে একটি প্রকাণ্ড দীঘি খনন করান। ইহার উত্তর তীরে নাকি তাঁহার বাসভবন ছিল। যে স্থানে তাঁহার পাঠান সৈন্যগণ বাস করিত আজিও উহা পাঠানপাড়া নামে পরিচিত।

চাটমোহর হইতে ৮।৯ মাইল উত্তর পূর্ব্বে হাণ্ডিয়াল বা **হাঁড়িয়াল** একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রাম। এককালে ইহা একটি বর্দ্ধিষ্ণু বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। রেশম এবং সুতীর কাপড় ক্রয় করিবার জন্য ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির একটি কুঠি বহুদিন ধরিয়া এখানে ছিল। এখানকার জগন্নাথ দেবের একটি প্রাচীন মন্দিরের উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে ভবানী দাস নামক এক ব্যক্তি ইহার সংস্কার করিয়াছিলেন। ইহার নিকটেই রাজসাহী এবং পাবনা জেলার সীমান্তে অবস্থিত সুবিশাল **চলন** বিল। বর্ত্তমানে ইহার বিস্তৃতি ১৪০ বর্গমাইল; পূর্ব্বে ইহার বর্গফল ৪২১ মাইল ছিল বলিয়া কথিত; পলি পড়িয়া ইহা দ্রুত ভরিয়া আসিতেছে। আত্রাই নদী এই বিলে আসিয়া পড়ে; এবং ক্ষুদ্র নদী গুমাণী হইয়া বড়াল ও হুরাসাগর নদীপথে ইহার জল ব্রহ্মপুত্র বা যমুনায় পতিত হয়। পুরাতন মন্দির, পুষ্করিণী ও বাড়ী ঘর হইতে ধারণা হয় চলন বিলের পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল পূর্ব্বে বেশ সমৃদ্ধ ছিল। হাঁড়িয়ালের ৩।৪ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে সমাজ নামক স্থানে বহু পুরাতন পুষ্করিণী দৃষ্ট হয়। কথিত আছে এই স্থানে মুঘলদিগের একটি কাছারী ছিল এবং নিকটস্থ মরীচপুরান গ্রামে একটি সৈন্যের ঘাঁটী ছিল। সমাজের এক মাইল উত্তরে শীতলাই গ্রামের জমিদারগণ এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ।

হাঁড়িয়ালের ১০ মাইল উত্তরে চাটমোহর হইতে প্রায় ১৯ মাইল দূরে তাড়াশ গ্রাম অবস্থিত। এখানকার রায় উপাধিধারী জমিদারগণও প্রসিদ্ধ। তাড়াশে বহু মন্দির আছে। ইহার মধ্যে একটি শিবমন্দিরের উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে ইহা নারায়ণদেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং ১৭১১ খৃষ্টাব্দে বলরাম দাস কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়াছিল।

ভাঙ্গুড়া—ঈশ্বরদি হইতে ২২ মাইল দূর। এখান হইতে বহু পরিমাণ মৎস্য ও পাট কলিকাতায় রপ্তানি হয়। স্টেশনের পরেই বড়াল নদী লাইন পার হইয়া দক্ষিণে চলিয়া গিয়াছে। ভাঙ্গুড়া হইতে প্রায় ৪ মাইল উত্তরে অষ্টমনীষা গ্রাম এক কালে সমৃদ্ধ ছিল এবং এখানে বহু মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

উল্লাপাড়া—ঈশ্বরদি হইতে ৩৬ মাইল দূরে ফুলঝুর নদীর তীরে অবস্থিত। করতোয়া নদী বগুড়া জেলার দক্ষিণে হলহলিয়ার সহিত মিলিত হইবার পর ফুলঝুর নামে অভিহিত হয় এবং উল্লাপাড়ায় সিরাজগঞ্জ লাইন পার হইয়া প্রায় ৪ মাইল দক্ষিণে হুরাসাগর নদে পতিত হয়। উল্লাপাড়া পাটের ব্যবসায়ের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র। এখান

হইতেও বহু পরিমাণ মৎস্য কলিকাতায় রপ্তানি হয়। ইহা শাহজাদপুরে যাইবার স্টেশন। **শাহজাদপুর** উল্লাপাড়া হইতে ৮ মাইল দক্ষিণে হুরাসাগরের তীরে অবস্থিত একটি পুরাতন নগর। এখানে মখদুম শাহ্-দৌলা নামক মুসলমান সাধুর সমাধি আছে। মখদুমশাহ্ আরব দেশের যমনের রাজপুত্র। কথিত আছে, তিনি পিতার অনুমতি লইয়া ধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করেন। পাবনা জেলায় শাহজাদপুরের দুই মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে পোতাজিয়ায় পৌছিলে তাঁহার জাহাজ ডাঙ্গায় লাগিয়া যায়। মখদুম শাহ্-দৌলা একটি চরে আবাস স্থাপন করেন। মখ্দুম শাহ্-দৌলার সহিত তাঁহার ভগিনী, তিনজন ভাগিনেয়, দ্বাদশ জন 'দরবেশ' এবং বহু সাঙ্গোপাঙ্গ আসিয়াছিলেন। কিংবদন্তী অনুসারে আগন্তুকদিগের সহিত তৎকালের হিন্দুরাজার বিরোধ উপস্থিত হয় এবং ক্রমে যুদ্ধ বাধে। প্রথম দুইটি যুদ্ধে মখদুম শাহের দল জয়ী হন; তৃতীয় যুদ্ধে তাঁহারা হারিয়া যান এবং শাহজাদা নিহত হন। তাঁহার ভগিনী অপমানের ভয়ে জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করেন। এখনও লোকে "সতী বিবির খাল" দেখাইয়া সেই ঘটনা স্মরণ করে। এখানে মখ্দুম শাহ তাঁহার ভাগিনেয়ত্রয় এবং সহচর দ্বাদশজন দরবেশের সমাধি ব্যতীত পরববর্ত্তী কালের আরও কয়েকজন আউলিয়ার সমাধি আছে। শেষোক্তদের মধ্যে শাহ হবিবুল্লার আস্তানায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই অর্ঘ্য প্রদান করেন এবং শাহ মস্তানের আস্তানা হইতে নাকি অন্ধকার রাত্রে মধ্যে মধ্যে এক ঝলক অত্যুজ্জ্বল আলোক আকাশের দিকে উঠিতে দেখা যায়। এখনে শাহজাদা মখদুম শাহের প্রতিষ্ঠিত একটি সুন্দর পুরাতন মসজিদ আছে। মখ্দুমশাহ্দৌলা আরবদেশের রাজপুত্র বা শাহজাদা ছিলেন বলিয়া স্থানটির নাম শাহজাদপুর হইয়াছে। মসজিদটি ইষ্টক নিৰ্ম্মিত এবং ৫২ ফুট লম্বা ও ৩১ ফুট চওড়া, ইহার ভিতরে ২৮টি কালো পাথরের থাম আছে। ইহার মধ্যে একটি থামের রং অপরগুলি হইতে কিছু বিভিন্ন। এঅঞ্চলে লোকের বিশ্বাস এই থামটিকে জড়াইয়া ধরিলে সন্তানহীনা নারী সন্তান লাভ করেন। মসজিদ ও কবরগুলির খরচের জন্য ৭১২ বিঘা নিষ্কর জমি আছে। বৈশাখ মাসে এখানে একটি বড় মেলা হয়। হিন্দুমুসলমান নির্ব্বিশেষে বহু লোক ইহাতে যোগদান করেন। এই মেলায় টাট্টু ঘোড়া বিক্রয় হয়। এই মেলায় সুন্দর পুতুল প্রভৃতি লোকশিল্পের নিদর্শনস্বরূপ কিছু কিছু জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়।

পোতাজিয়ায় একটি পুরাতন ও ভগ্নপ্রায় নবরত্ন মন্দির আছে। কথিত আছে, যে ইহার চূড়া অত্যন্ত উচ্চ ছিল এবং বহুদূর হইতে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত; জনৈক নবাবের আদেশে ইহার উপরের দুইটি তলা নাকি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁহাদের জমিদারী নিজে দেখাশুনা করিতেন, সে সময়ে তিনি মধ্যে মধ্যে শাহজাদপুরে আসিয়া অবস্থান করিতেন। তাঁহার "ছিন্নপত্রের" কয়েকটি পত্র এই স্থান হইতে লেখা।

শাহাজাদপুর হইতে ৬।৭ মাইল দক্ষিণে ইছামতী বড়াল ও হুরাসাগরের সঙ্গমস্থলে মথুরা থানার অন্তর্গত পাবনার প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র **বেরা** অবস্থিত। ইহা পাটের একটি

প্রসিদ্ধ গঞ্জ। ইহার কিছু নীচে হুরাসাগর যমুনা বা ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে; হুরাসাগরের উৎসও যমুনা হইতে, সিরাজগঞ্জের কিছু নীচে।

চাটমোহর, উল্লাপাড়া ও শাহজাদপুরের নিকটস্থ বিল হইতে শীতকালে ছোট ছোট এক রকম মুক্তা পাওয়া যায়। অল্প দামে কলিকাতা ও বগুড়ায় ইহা বিক্রয় হয়।

সিরাজগঞ্জ বাজার—ঈশ্বরদি হইতে ৫০ মাইল ও কলিকাতা হইতে ১৭৫ মাইল দূর। ইহা পাবনা জেলার মহকুমা এবং বাংলাদেশের একটি প্রধান বন্দর। যমুনা বা ব্রহ্মপুত্রকূলে অবস্থিত ইহা একটি আধুনিক গঞ্জ। সিরাজ অ লি নামক একজন জমিদার ইহার পত্তন করেন বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে সিরাজগঞ্জ। সিরাজগঞ্জ ঘাট স্টেশন হইতে স্টীমারযোগে ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের ঢাকা বিভাগের জগন্নাথগঞ্জ স্টেশন হইতে মাঝারি মাপের রেলপথ ধরিয়া ময়মনসিংহ, ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে যাওয়া যায়। সিরাজগঞ্জ গত ৫০ বৎসরের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড নগর হইয়া উঠিয়াছে। এক নারায়ণগঞ্জ ব্যতীত বাংলাদেশে এত বড় আভ্যন্তরীন বন্দর এখন আর নাই। অবশ্য কলিকাতা ও চট্টগ্রামের কথা স্বতন্ত্র, কারণ এই দুইস্থানে সমুদ্রগামী জাহাজ আসিয়া থাকে। এখান হইতে প্রতিবৎসর রেল বা স্টীমারযোগে লক্ষ লক্ষ টাকার পাট চালান যায়। যমুনা বা নূতন ব্রহ্মপুত্রের গতি পরিবর্ত্তন হওয়ায় সিরাজগঞ্জ শহরটি অতি দ্রুত ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। সম্প্রতি স্থানীয় লোক ও বাংলা সরকারের প্রচেষ্টায় ভাঙ্গনের প্রসার রোধ করা হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের এই খাতটি নূতন। পূর্ব্বে ইহা গারো পাহাড়ের নীচে দিয়া ময়মনসিংহ জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভৈরববাজারের নীচে মেঘনায় পড়িত। এই পুরাতন খাতটি মজিয়া আসিতেছে। পলি পড়িয়া নদীর খাত উচ্চ হইতে থাকিলে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে তিস্তার প্রসিদ্ধ খাতের পর ব্রহ্মপুত্র পুরাতন খাত ছাড়িয়া রংপুর, বগুড়া, ও পাবনা জেলার পূর্ব্বদিক দিয়া যমুনা নদীর খাতে বহিয়া গঙ্গার সহিত যুক্ত হয়। পূর্ব্বে তিস্তা দক্ষিণে গঙ্গা বা পদ্মায় পড়িত, কিন্তু বন্যার পরে পূর্ব্বদিকে হটিয়া যমুনা বা ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হয়। গঙ্গার ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে গমনের ন্যায় ব্রহ্মপুত্র ক্রমশঃ পশ্চিমদিকে আসিতেছে। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহা চট্টগ্রাম বন্দরের নিকট সমুদ্রে মিলিত হইত। ইহার পর ভৈরববাজারের নীচে দিয়া মেঘনার সহিত মিলিত হইয়া বহিতে থাকে। তাহার পর ঢাকা জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া পর পর ধলেশ্বরী ও যমুনার খাত বাছিয়া লইয়াছে।

১৮৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দে সিরাজগঞ্জ মহকুমার ইউসুফশাহী পরগণায় জমিদারগণের খাজনা এবং সেস্ প্রভৃতি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রজাগণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ও বিদ্রোহী হয়। তাহাদের নেতা ঈশান রায় বিদ্রোহীর রাজা নামে অভিহিত হয়। এই আন্দোলন ক্রমে পাবনা জেলার অন্যত্র এবং পার্শ্ববর্ত্তী জেলাগুলিতে ছড়াইয়া পড়ে। গভর্ণমেন্টের মধ্যস্থতায় এবং ১৮৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দের দুভিক্ষে এই হাঙ্গামা চাপা পড়িয়া যায়। ইহা হইতেই ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের প্রজাস্বত্ব আইনের সূত্রপাত হয়।

গোপালপুর—কলিকাতা হইতে ১৩২ মাইল। এখানে একটি প্রকাণ্ড চিনির কল স্থাপিত হইয়াছে।

আবদুলপুর জংশন—কলিকাতা হইতে ১৩৬ মাইল দূর। এই স্থান হইতে একটি শাখা লাইন রাজশাহী ও গোদাগাড়ী-কাটিহার শাখার আমনুরা জংশন হইয়া মালদহ জেলার চাপাই-নবাবগঞ্জ পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই শাখা পথে নন্দনগাছি সরদা রোড, রাজশাহী, খেতুর রোড ও চাপাই-নবাবগঞ্জ উল্লেখযোগ্য স্টেশন। ঈশ্বরদি জংশন হইতে চাপাই-নবাবগঞ্জ পর্য্যন্ত সরাসরি গাড়ী যাতায়াত করে।

নন্দনগাছি—আবদুলপুর জংশন হইতে ১১ মাইল। এখান হইতে ৪ মাইল উত্তরে **পুঁটিয়া** অবস্থিত। এখানে একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ জমিদার বংশের বাস। এই বংশের পূর্ব্বপুরুষ বৎসাচার্য্য খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে পুঁটিয়ার নিকটবর্ত্তী একটি গ্রামে ধর্ম্মসাধনায় লিপ্ত থাকেন; তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান এবং সাধু চরিত্রের কথা চারিদিকে খ্যাত ছিল। আকবরের সেনাপতি মহারাজ মানসিংহ যখন পাঠান সর্দ্দার-গণকে দমন করিবার জন্য এ অঞ্চলে আগমন করেন তখন তিনি বৎসাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া পাঠান জায়গীরদার লস্কর খাঁর জমিদারী তাঁহাকে অর্পণ করিতে চাহেন। বৎসাচার্য্য ইহা প্রত্যাখ্যান করিলে মানসিংহ তাঁহার পুত্র পীতাম্বরকে ইহা অর্পণ করেন। পীতাম্বরের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা নীলাম্বর এই জমিদারীর উত্তরাধিকারী হন এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে রাজা উপাধি লাভ করেন। এই জমিদারী এখন পাঁচ আনী, চার আনী, এক আনী প্রভৃতি কয়েকটি তরফে বিভক্ত।

জমিদারগণের প্রতিষ্ঠিত শিবসাগর নামক সুন্দর একটি পুষ্করিণীর তীরে ভুবনেশ্বর মহাদেবের একটি চমৎকার সুউচ্চ পঞ্চরত্ন মন্দির আছে। গোবিন্দ সরোবর নামক আর একটি জলাশয়ের ধারে দোলমণ্ডপ এবং ইহার সম্মুখে পাঁচ আনী রাজবাটীতে গোবিন্দদেবের সুন্দর কারুকার্য্যখচিত ইষ্টক-নির্ম্মিত মন্দির আছে।

পুঁটিয়ার মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী দান এবং পুণ্যকার্য্যে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন; ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি সরকারের নিকট হইতে মহারাণী উপাধি লাভ করেন।

পুঁটিয়ার ১২ মাইল উত্তরে **তাহিরপুর গ্রামে** আর একটি অতি প্রাচীন জমিদার বংশের বাস। নাটোর স্টেশন হইতেও তাহিরপুর যাওয়া যায়। সেখান হইতেও এইস্থান প্রায় ১২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে, তবে পথে একটি খেয়া পার হইতে হয়। কথিত আছে, তাহিরপুর জমিদারবংশের প্রতিষ্ঠাতা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কামদেব ভট্ট খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে একজন পাঠান জায়গীরদারকে পরাজিত করিয়া তাঁহার সম্পত্তি অধিকার করেন। কামদেব ভট্টের বংশীয়গণের মধ্যে রাজা কংসনারায়ণই সর্ব্বপ্রধান। ইনি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে এ অঞ্চলে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি মগদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন এবং বারভুঁইয়াদের অন্যতম ছিলেন বলিয়া কথিত। তাঁহার পিতামহ উদয়নারায়ণ প্রসিদ্ধ রাজা গণেশের সময়ে রাজা উপাধি পাইয়াছিলেন। কংসনারায়ণ বাংলায় আধুনিকালের দুর্গোৎসবের প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই সম্বন্ধে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে বৃদ্ধ বয়সে রাজা কংসনারায়ণ একটি মহাযজ্ঞ সম্পাদন করিবার মনস্থ করিলে তখনকার দিনে

পণ্ডিতগণ ব্যবস্থা দিয়াছিলেন যে তিনি সামন্তরাজা বিধায় বিশ্বজিৎ ও রাজসূয় যজ্ঞ করিবার অধিকারী নহেন এবং কলিতে অশ্বমেধ বা গোমেধ যজ্ঞও নিষিদ্ধ। সে জন্য তাঁহারা কংসনারায়ণকে রামচন্দ্রের ন্যায় শারদীয় দুর্গোৎসব করিবার পরামর্শ দান করেন। কংসনারায়ণের পুরোহিতবংশীয় সুপণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রী প্রভৃতি বহু আয়াস স্বীকার করিয়া পূজার পদ্ধতি বা বিধি প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং সাড়ে আট লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া সাড়ম্বরে কংসনারায়ণ দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন। ইহাতে চারিদিকে কংসনারায়ণের নাম প্রচারিত হয়। ইহাতে নিকটবর্ত্তী ভাতুরিয়া পরগণার ভূম্যধিকারী রাজা জগৎনারায়ণ ঈর্ষান্বিত হইয়া নয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে দুর্গাপূজার প্রবর্ত্তক সুরথ রাজার ন্যায় সুকাল বসন্তকালে বহু ধুমধামের সহিত পূজা সম্পন্ন করেন, কিন্তু তথাপি কংসনারায়ণের অকালের শারদীয়া পূজা বাংলার চারিদিকে প্রচলিত হইল এবং সুকালের বাসন্তী পূজার বিশেষ চলন হয় নাই। কথিত আছে, ইহা লক্ষ্য করিয়া জগৎনারায়ণ দুঃখ করিলে তাঁহার পুরোহিত নাকি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে কংসনারায়ণের পূজার উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম্মসাধন এবং তাঁহার ছিল ঈর্ষা ও দাম্ভিকতা প্রকাশ এবং সেই অনুপাতেই দুজনে ফললাভ করিয়াছেন। যাহা হউক শারদীয়া ও বাসন্তীপূজা তদবধি বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হইতেছে এবং ভারতের অপর কোন স্থানেই এই ধরণের পূজার ব্যবস্থা নাই।

কথিত আছে রাজা কংসনারায়ণই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণকে কুলীন, কাপ ও শ্রোত্রিয় এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কংসনারায়ণের বংশের পুত্রশাখা লুপ্ত হইলে, কন্যাশাখা হইতে তাহিরপুরের বর্ত্তমান রাজবংশের আরম্ভ হয়।

সরদা রোড—আবদুলপুর জংশন হইতে ১৫ মাইল দূর। এই স্থান হইতে ৩ মাইল দক্ষিণে গঙ্গাতীরবর্ত্তী সরদা বা সরদহে যাইতে হয়। তথায় বাংলার পুলিশ বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণের জন্য একটি ট্রেণিং কলেজ আছে। যে বাড়ীতে কলেজটি অবস্থিত পূর্ব্বে উহা ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির রেশমকুঠি ছিল। পদ্মাতীরবর্ত্তী এই কলেজটির অবস্থান অতি মনোরম। কলেজের পাশেই তখনকার দিনের একটি ছোট গোরস্থান আছে; ফরাসীভাষায় উৎকীর্ণ একটি সমাধিস্তম্ভ হইতে জানিতে পারা যায় যে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে একটি ফরাসী শিশু এখানে সমাহিত হইয়াছিল।

সরদার নিকটেই পদ্মা হইতে বড়াল নদী উঠিয়াছে; এই নদীর অপর পারে চারঘাট গ্রাম এ অঞ্চলের একটি বাণিজ্যকেন্দ্র। নদী পারাপারের জন্য এখানে একটি খেয়া আছে।

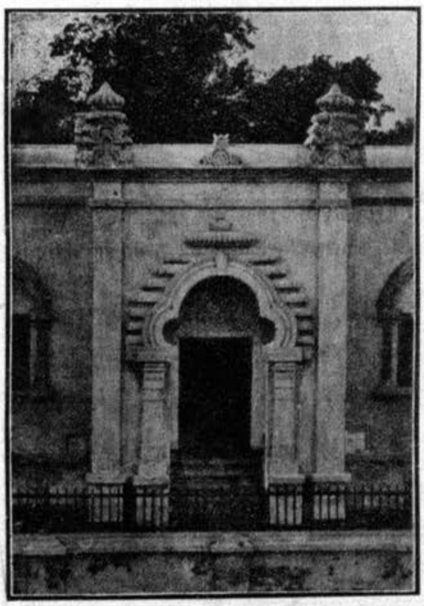
চারঘাট হইতে ১১ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে **বাঘা** গ্রাম; প্রধান লাইনের গোপালপুর স্টেশন হইতেও এখানে আসা যায়; পশ্চিমে ১২।১৩ মাইল পথ। এই গ্রামে একটি সুন্দর প্রাচীন মস্‌জিদ আছে। ইহার শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে গৌড়রাজ নসরৎশাহ ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে এই মস্‌জিদ প্রতিষ্ঠা করেন। মস্‌জিদটি একটি প্রকাণ্ড পুষ্করিণীর ধারে অবস্থিত। ইহা গৌড়ের তৎকালীন মস্‌জিদ প্রভৃতির ধরণে নির্ম্মিত;

মস্‌জিদটি এখন সরকারী রক্ষিত-কীর্ত্তি বিভাগের তত্ত্বাবধানে আছে। মস্‌জিদের প্রাঙ্গনে হজরৎ মৌলানা শাহ্‌-দৌলা নামক একজন প্রসিদ্ধ সাধুর সমাধি আছে।



বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি ভবন, রাজশাহী

রাজশাহী—আবদুলপুর জংশন হইতে ২৫ মাইল ও কলিকাতা হইতে ১৭৯ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা রাজশাহী জেলা ও বিভাগের সদর শহর ও পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত। রামপুর ও বোয়ালিয়া নামক দুইটি পল্লী লইয়া এই শহরটি গঠিত। এই দুই নামের পরিবর্ত্তে ইহা এখন রাজশাহী নামেই পরিচিত। ব্লখ্‌ম্যান সাহেবের মতে মাহমুদশাহী ও বারবক শাহী পরগণার নামের ন্যায় হিন্দুরাজা গণেশের পর হইতে রাজশাহী



বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চিত্র শালার প্রবেশদ্বার

এই মিশ্র নামের উৎপত্তি হয়। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে রামপুরে রেশমের কারবার খুব বাড়িয়া যায় এবং ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসীরা এখানে কুঠি স্থাপন করিয়াছিলেন। ওলন্দাজ কোম্পানির সুবৃহৎ কুঠি "বড় কুঠি" নামে পরিচিত ছিল এবং এই স্থানে তাঁহাদের অনেকগুলি কামান ছিল। ইহার একটি কামান এখনও রাজশাহীর পুলিশ

লাইনে দেখিতে পাওয়া যায়। বড় কুঠির হাতার মধ্যে তখনকার দিনের একটি ছোট গোরস্থান আছে। রাজশাহী শহরের দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে রাজশাহী কলেজ, পুঁটিয়ার মহারাণী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কলেজ ও বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত চিত্রশালা উল্লেখযোগ্য। রাজশাহীর কলেজটি সরকারী কলেজ। পদ্মার তীরে অবস্থিত এই কলেজটির দৃশ্য অতি সুন্দর। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির মিউজিয়ম্ বা চিত্রশালা কেবলমাত্র রাজশাহীর নহে, সমগ্র বাংলার গৌরবের বস্তু। প্রধানতঃ উত্তরবঙ্গ হইতে সংগৃহীত প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতি ও শিল্প সাধনার নিদর্শন এখানে রক্ষিত হইয়াছে। যাঁহারা বাংলার ইতিহাস আলোচনায় অনুরাগী এই চিত্রশালাটি তাঁহাদের পক্ষে অবশ্য দ্রষ্টব্য। চিত্রশালার ভবনটি হিন্দু স্থাপত্যের আদর্শে নির্ম্মিত। রাজশাহী কলেজের দক্ষিণে একটি পুরাতন মস্জিদ এবং মখ্দুমশাহ নামক পীরের দরগাহ্ আছে। ইহার পশ্চিমে রাজশাহীর বিশাল জেলখানা এবং তাহার পশ্চিমে শহরের সুন্দর ও বিস্তৃত ময়দান অবস্থিত।



রাজশাহী কলেজ

মুসলমান আমলে রাজশাহী একটি প্রকাণ্ড পরগণা ও জমিদারীরূপে পরিচিত ছিল। বর্ত্তমান রাজশাহী জেলা ছাড়া বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের কতকাংশও ইহার অন্তর্গত ছিল। আজিও শেষোক্ত দুই জেলায় রাজশাহী নামে একটি পরগণা আছে। লালা উপাধিধারী শাণ্ডিল্য গোত্রীয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ বহুকাল হইতে রাজশাহী পরগণার জমিদার ছিলেন। এই বংশের রাজা উদয়নারায়ণ রায়ের সহিত রাজস্ব ব্যাপার লইয়া নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর বিবাদ ও যুদ্ধ হওয়ার ফলে রাজশাহী জমিদারী এই বংশের হস্তচ্যুত হয় এবং উহা নাটোর রাজবংশের অধিকারে আসে। উত্তরকালে নাটোর জমিদারী হইতেও কতকগুলি বিভিন্ন জমিদারীর সৃষ্টি হয়। বর্ত্তমানে রাজশাহী জেলার মধ্যে নাটোর, দিঘাপতিয়া, পুঁটিয়া ও তাহিরপুরের জমিদার বংশের নাম উল্লেখযোগ্য।

খেতুররোড—আবদুলপুর জংশন হইতে খেতুররোড ৪০ মাইল দূর। এই স্থান হইতে প্রেমতলী ও শ্রীপাট খেতুরে যাইতে হয়। খেতুর রোড স্টেশন হইতে খেতুর ১১ মাইল দূর। রাজশাহী হইতেও ১৩ মাইল পশ্চিমে খেতুরে যাইবার রাস্তা আছে। খেতুর সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব মহাজন নরোত্তম ঠাকুরের জন্মস্থান ও পদ্মানদীর তীরে অবস্থিত। প্রেমতলী হইতে খেতুর দুই মাইল দূর। ঠাকুর নরোত্তম খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে খেতুরের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্ত ও মাতার নাম নারায়ণী দেবী। বৈষ্ণবসাহিত্যে উল্লিখিত আছে যে শ্রীচৈতন্যদেব গৌড় গমন কালে খেতুরির দিকে লক্ষ্য করিয়া "নরোত্তম" বলিয়া ডাকিয়াছিলেন। তখনও নরোত্তমের জন্ম হয় নাই। বৈষ্ণবগণের বিশ্বাস যে শ্রীচৈতন্যদেবের আহ্বানেই নরোত্তমের আবির্ভাব হইয়াছিল। অতি বাল্য বয়সে নরোত্তম বিষয়সুখ পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজে বৃন্দাবনে গমন করেন এবং তথায় লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার অদ্ভুত প্রেম ও পাণ্ডিত্য দেখিয়া গোস্বামিগণ তাঁহাকে "ঠাকুর মহাশয়" উপাধি প্রদান করেন। গুরুর আদেশে নরোত্তম স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া হরিনাম প্রচার ও কীর্ত্তনে আত্মনিয়োগ করেন। "প্রার্থনা", "প্রেমভক্তি চান্দ্রকা" ও "পাষণ্ড দলন" প্রভৃতি তৎপ্রণীত গ্রন্থ নিচয় বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত নিত্য পঠিত হইয়া থাকে। তাঁহার জীবন কথা নরহরি চক্রবর্ত্তী কৃত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "নরোত্তম বিলাসে" বর্ণিত হইয়াছে। চাঁদ রায় নামক জনৈক দস্যু সর্দ্দার ঠাকুর নরোত্তমের প্রভাবে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করে। ১৫০৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে নরোত্তম স্বীয় জন্মস্থান খেতুরিতে ছয়টি বিগ্রহ স্থাপন করিয়া মহাসমারোহে বৈষ্ণব সম্মেলনের অনুষ্ঠান করেন। ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সর্ব্ব প্রথম মহাসম্মেলন। এই সম্মেলনে বাংলার সকল স্থানের বৈষ্ণব মহাজনগণ যোগদান করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে এই ঘটনা বহুস্থানে বিবৃত হইয়াছে। নরোত্তমের খুল্লতাতপুত্র রাজা সন্তোষ এই কার্য্যে নরোত্তমের সর্ব্বপ্রধান সহায় হইয়াছিলেন। নরোত্তম প্রবর্ত্তিত কীর্ত্তন গানের পদ্ধতি "গরানহাটি" বা "গড়েরহাটি" নামে পরিচিত। গড়ের হাট পরগণায় প্রথম প্রবর্ত্তিত বলিয়া ইহার এইরূপ নাম হইয়াছে। বর্ত্তমানে বাংলাদেশের বহু কীর্ত্তনিয়া এই পদ্ধতিতে কীর্ত্তন গান করিয়া থাকেন। আজিও প্রতি বৎসর লক্ষ্মীপূজার সময় শ্রীপাট খেতুরে তিন দিনব্যাপী বিরাট মেলার অধিবেশন ও মহোৎসব হয়। যাত্রীরা প্রেমতলীতে স্নান করিয়া খেতুরের পুরাতন মন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গ, বিষ্ণুপ্রিয়া এবং নিত্যানন্দের বিগ্রহ দর্শন করেন। এই মেলায় সুন্দর দেশীয় পুতুল প্রভৃতি লোকশিল্পের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।

খেতুরের নিকটে **বিজয়নগর** নামে একটি গ্রাম আছে। ইহা প্রেমতলী হইতে ৪ মাইল পূর্ব্বদিকে এবং রাজশাহী হইতে খেতুরের পথে ৯ মাইল দূর। অনেকে অনুমান করেন যে এই স্থানে সেন বংশীয় নৃপতি বল্লাল সেনের পিতা রাজা বিজয় সেনের রাজধানী ছিল এবং পরে তিনি ও তাঁহার উত্তরাধিকারীরা রাজধানী এখান হইতে লক্ষণাবতী বা গৌড়ে লইয়া যান। ইহার উত্তরদিকস্থ **দেবপাড়া** নামক পল্লী হইতে বিজয় সেনের একখানি প্রস্তরলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে কর্ণাট দেশের সামন্ত সেনের পৌত্র ও হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন রাঢ় দেশের অধিপতি হইয়াছিলেন এবং পালবংশীয়দিগের নিকট হইতে গৌড় জয় করিয়াছিলেন

এবং পরে কামরূপ, কলিঙ্গ ও মিথিলা অধিকার করেন। এই প্রশস্তি প্রসিদ্ধ কবি উমাপতি ধর কর্ত্তৃক রচিত এবং শিল্পী চাণক শূলপাণি কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ। এই প্রস্তর লিপিতে উল্লিখিত বিজয় সেন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রদ্যুম্নেশ্বর মহাদেবের মন্দির নিকটবর্ত্তী তৎপ্রতিষ্ঠিত বৃহৎ হ্রদ পদ্মসর নামক দীঘির তীরে অবস্থিত ছিল বলিয়া অনেকের অনুমান। এই স্থান হইতে উক্ত মন্দিরের প্রবেশদ্বারের "উড়ুম্বর" বা চৌকাট বলিয়া কথিত দুইখানি দীর্ঘ প্রস্তর আবিষ্কৃত হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী পালপুর নামক স্থানে সুদীর্ঘ দুর্গ পরিখার চিহ্ন আজিও দেখিতে পাওয়া যায়।

খেতুর হইতে চারি মাইল দূরে **মণ্ডয়েল** বা মাড়ইল নামক গ্রামে ধ্বংস প্রাপ্ত চারিটি মৃত্তিকা স্তূপ আছে; উহাদের মধ্যে একটি ৪০ফুট উচ্চ। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি এই স্থান হইতে বহু প্রাচীন নরমূর্ত্তি ও ষোড়শ স্থানীয় জৈন তীর্থঙ্কর শান্তিনাথের প্রস্তর মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র এই স্থান হইতে প্রথম জৈন তীর্থঙ্কর ঋষভ দেবের মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। অনেকে অনুমান করেন যে এই স্থানের অধিবাসিগণ বহু পূর্ব্বে জৈন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। বর্ত্তমানে এখানকার অধিবাসিগণের মধ্যে সাঁওতালের সংখ্যাই অধিক।

চাপাই নবাবগঞ্জ—আবদুলপুর জংশন হইতে ৫৬ মাইল দূর। এই শাখা লাইন আমনুরা জংশনে গোদাগাড়ীঘাট-মালদহ-কাটিহার মাঝারি মাপের লাইন পার হইয়াছে। চাপাই-নবাবগঞ্জ মহানন্দার তীরে অবস্থিত ও মালদহ জেলার একটি বাণিজ্যপ্রধান স্থান। এখান হইতে প্রচুর পরিমাণে চাউল চালান যায়। এখানকার প্রস্তুত কাঁসা ও পিতলের বাসন বেশ বিখ্যাত। মহানন্দার জলোচ্ছ্বাস হইতে বন্দরটিকে রক্ষা করিবার জন্য নদীতীর দিয়া একটি উচ্চ বাঁধ আছে। এখানে মিউনিসিপ্যালিটি ও একটি মুনসেফী আদালত আছে। ইহার ১০৷১২ মাইল দক্ষিণে গোদাগাড়ীর নিকট মহানন্দা গঙ্গায় গিয়া পড়িয়াছে। চাপাই-নবাবগঞ্জের অপর পারে মহানন্দাতীরে বারঘরিয়া গ্রাম। সেখান হইতে ১২ মাইল দূরে মালদহের পথে প্রসিদ্ধ গ্রাম শিবগঞ্জ। শিবগঞ্জের সুন্দর ও সূক্ষ্ম রেশমের কাপড় বিখ্যাত।

নাটোর—কলিকাতা হইতে ১৪৬ মাইল দূর। স্টেশন হইতে নাটোর শহরের দূরত্ব প্রায় দুই মাইল। ইহা নারদ নামক একটি লুপ্তপ্রায় নদীর তীরে অবস্থিত। ইংরেজ আমলের গোড়া হইতে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহা রাজশাহী জেলার সদর ছিল। বর্ত্তমানে ইহা একটি মহকুমা মাত্র। নাটোরের রাজবংশ এককালে প্রায় অর্দ্ধবঙ্গের অধীশ্বর ছিলেন। রামজীবন ও রঘুনন্দন নামক দুই ভ্রাতা এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। রঘুনন্দন প্রথম জীবনে পুঁটিয়া রাজসংসারে সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত হন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে একদিন নিদ্রিত অবস্থায় তাঁহার মাথার উপর একটি সাপকে ফণা বিস্তার করিতে দেখিয়া পুঁটিয়ার রাজা দর্পনারায়ণ তাঁহাকে বলেন যে তুমি রাজা হইবে, কিন্তু তখন আমাদের জমিদারী কাড়িয়া লইও না। কিছু দিন বাদে দর্পনারায়ণ তাঁহাকে উকীল নিযুক্ত করিয়া ঢাকার নবাব দরবারে পাঠাইয়া দেন। ঢাকা হইতে রঘুনন্দন মুর্শিদকুলী খাঁর সহিত মুর্শিদাবাদে আগমন করেন। তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁহাকে প্রধান কাননগো বঙ্গাধিকারী দর্পনারায়ণের

অধীনে নায়েব কাননগোর পদ প্রদান করেন। স্বীয় প্রতিভাবলে রঘুনন্দন মুর্শিদকুলী খাঁর প্রিয় পাত্র হইয়া উঠেন এবং তাঁহার অনুগ্রহে অনেক জমিদারী লাভ করেন। রঘুনন্দনের ভ্রাতা রামজীবনের নামেই এই সকল জমিদারী গৃহীত হইয়াছিল। রামজীবনের পুত্র কালিকাপ্রসাদ অল্প বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার দত্তক পুত্র রামকান্ত নাটোর জমিদারীর অধীশ্বর হন। এই রামকান্তের পত্নীই বঙ্গবিখ্যাতা মহারাণী ভবানী। একটি মাত্র কন্যা লইয়া মহারাণী ভবানী ৩২ বৎসর বয়সে বিধবা হন। অতঃপর তিনি দেবসেবা, দরিদ্রসেবা, জলাশয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পুণ্যকার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। কাশীর দুর্গাবাড়ী মন্দির ইহারই কীর্ত্তি। এক কাশীধামেই তিনি ৩৮০টি মন্দির প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দরিদ্রদের চিকিৎসার জন্য বহু গ্রামে তিনি কবিরাজ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। নাটোর হইতে পূর্ব্বদিকে বগুড়া জেলার পীঠস্থান ভবানীপুর পর্য্যন্ত যে উচ্চ রাস্তা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন তাহা আজও স্থানে স্থানে বর্ত্তমান আছে এবং রাণী ভবানীর জাঙ্গাল নামে পরিচিত। দানে ও সৎকার্য্যে তিনি ৫০ ক্রোর টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত। তাঁহার মহত্ত্বের কথা বাংলার ঘরে ঘরে কীর্ত্তিত।



নাটোর রাজপ্রাসাদ

অর্দ্ধবঙ্গেশ্বরী মহারাণী ভবানীর পুণ্যনাম বাংলার ইতিহাসে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের শাসনকালে নানা কারণে নাটোরের বিশাল জমিদারীর অধিকাংশ এই বংশের হস্তচ্যুত হইয়া যায় এবং উহা হইতে বাংলার বিভিন্ন জেলায় কয়েকটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জমিদারীর সৃষ্টি হয়। নাটোরের জমিদারী বড় তরফ ও ছোট তরফে বিভক্ত হয়। বড় তরফের রাজারা বৈষ্ণব এবং ছোট তরফের রাজারা শাক্ত। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এ অঞ্চলে জমিদাররাই পুলিস ও শান্তি রক্ষার কার্য্য করিতেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণ পুলিসের কার্য্যের জন্য সরকার হইতে বাৎসরিক ৩৬,৯২৬৲ টাকা পাইতেন। নাটোর রাজবংশের অধিকাংশ প্রাচীন কীর্ত্তি ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। রাজপ্রাসাদের পরিখাগুলি আজিও বর্ত্তমান আছে। ছোট তরফের উপাস্য দেবতা জয়কালীর মন্দিরে নাটোরের প্রাচীন গৌরবের চিহ্ন কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, কারণ ইহা ভূমিকম্পে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় নাই। বড় তরফের স্বর্গীয় মহারাজা জগদিন্দ্র নাথ রায় ভূমিকম্পের পর তাঁহার বাসভবন ও ইষ্টদেবতা শ্যামসুন্দরের

মন্দির নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করান। তিনি সুকবি, সঙ্গীতজ্ঞ ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি "মানসী ও মর্ম্মবাণী" নামক মাসিক পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন এবং "সন্ধ্যাতারা" ও "নূরজাহান" নামক পুস্তক লিখিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করেন।

মহারাণী ভবানীর বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী দয়ারাম রায়ের বংশধর **দিঘাপতিয়ার** রাজারা নাটোরের এক মাইল উত্তরে দিঘাপতিয়া গ্রামে বাস করেন। কথিত আছে নাটোররাজ রামজীবনের আদেশে তাঁহার প্রধান ও বিশিষ্ট কর্ম্মচারী দয়ারাম রায় বহু সৈন্য লইয়া নবাব মুর্শীদকুলী খাঁর পক্ষে সীতারাম রায়কে দমন করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। সীতারামের পতনের পর তাঁহার সম্পত্তি নাটোর জমিদারবংশের অধীনে আসে। নাটোর-রাজ প্রীত হইয়া রাজশাহী ও যশোহর অঞ্চলে বহু ভূসম্পত্তি দয়ারাম রায়কে প্রদান করেন। এইরূপে দিঘাপতিয়া জমিদারীর আরম্ভ হয়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভীষণ ভূমি-কম্পে দিঘাপতিয়ার পুরাতন প্রাসাদ ধ্বংস হইয়া গেলে স্বর্গীয় রাজা প্রমদানাথ রায় বাহাদুর দিঘাপতিয়ায় একটি বিশাল প্রাসাদ ও সুন্দর উদ্যান নির্ম্মাণ করেন। উত্তরবঙ্গে এইরূপ মনোরম উদ্যান অতি অল্পই আছে।



জয়কালীর মন্দির, নাটোর

নাটোরের চারিদিকে সমগ্র মহকুমা নদী ও খালবিলে পরিপূর্ণ এবং বর্ষাকালে লোকে বড় বড় মাটির গামলায় করিয়া বাড়ী বাড়ী যাতায়াত করে।

সান্তাহার জংশন—কলিকাতা হইতে ১৭৪ মাইল দূর। সান্তাহারের পুরাতন নাম সুলতানগঞ্জ। ইহা বগুড়া জেলার একটি নগণ্য পল্লী ছিল, কিন্তু রেলওয়ের কল্যাণে এখন একটি ছোটখাট শহরে পরিণত হইয়াছে। ইহা পাটের কারবারের একটি

বিখ্যাত স্থান। সান্তাহার জংশন হইতে একটি মাঝারি মাপের লাইন (মিটার গেজ) বগুড়া ও গাইবান্ধা হইয়া পার্ব্বতীপুর-আমিনগাঁও লাইনের কাউনিয়া জংশন পর্য্যন্ত গিয়াছে।

সান্তাহারের চারি মাইল পশ্চিমে অবস্থিত **নওগাঁ** রাজসাহী জেলার অন্যতম মহকুমা। সান্তাহার স্টেশন হইতে নওগাঁ পর্য্যন্ত ঘোড়ার গাড়ী বা মোটরবাসে যাওয়া যায়।

নওগাঁর শহরে গাঁজার বড় বড় গুদাম দেখিতে পাওয়া যায়। নাওগাঁ থানা এবং নিকটবর্ত্তী বাদলগাছী ও মহাদেবপুর থানার কয়েকটি গ্রামে সরকারী তত্ত্বাবধানে গাঁজার চাষ হইয়া থাকে; এই গাঁজার চাষের জন্যই নওগাঁ একটি মহকুমার সদরে পরিণত হইয়াছে।

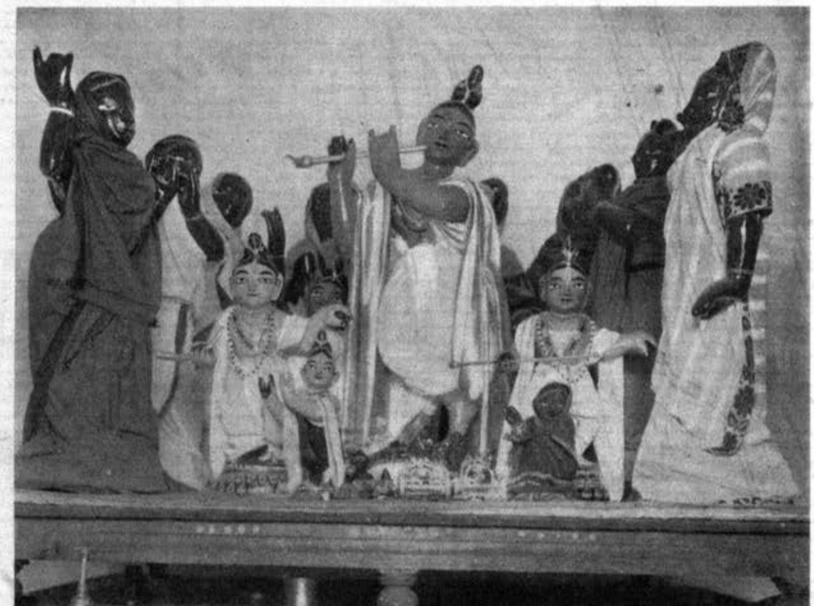
নওগাঁ হইতে ৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে **দুবলহাটী** গ্রামে একটি প্রাচীন জমিদার বংশের বাস। কথিত আছে, এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা জগৎরাম রায় বাণিজ্য ব্যপদেশে এই স্থান দিয়া নৌকাযোগে যাইবার সময়ে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া রাজরাজেশ্বরীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া এই গ্রামেই বাস করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপেই তাঁহার জমীদারীর সূত্রপাত হয়। নবাব সরকারে তাঁহার বাৎসরিক খাজনা ধার্য্য হইয়াছিল ২২ কাহন কই মাছ।

নওগাঁ হইতে ১১ মাইল উত্তরপশ্চিমে **বলিহার** গ্রামেও একটি জমিদার বংশ আছেন। গ্রামের নিকটেই ৫০।৬০টি পুষ্করিণী দৃষ্ট হয়। প্রবাদ, মহারাজ মানসিংহ যখন পাঠানদিগকে দমন করিতে বাংলায় আসেন তখন তাঁহার সৈন্যদল কর্ত্তৃক এগুলি খনিত হইয়াছিল।

সান্তাহার হইতে ১২ মাইল ও নওগাঁ হইতে ৮ মাইল পশ্চিমে "ভীমের জাঙ্গাল" ও "ভীম সাগর" দীঘি অবস্থিত। ভীমের জাঙ্গাল নামক দুর্গপ্রাকারবৎ রাজপথ উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে দৃষ্ট হয়। ইহা প্রসিদ্ধ জননায়ক মহাবীর দিব্যের ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমের কীর্ত্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ। দ্বাদশ শতাব্দীতে পালবংশীয় রাজা দ্বিতীয় মহীপাল অত্যন্ত অত্যাচারী হইয়া উঠায় বাংলার প্রজাপুঞ্জ তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং সম্মুখযুদ্ধে তাঁহাকে হত্যা করিয়া বিদ্রোহের নায়ক মহাবীর দিব্যকে তাঁহাদের রাজা নির্ব্বাচিত করে। দিব্য অত্যন্ত কর্ত্তব্যনিষ্ঠার সহিত এই গুরুভার পালন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা রুদোকের পুত্র ভীম বরেন্দ্রীর সিংহাসন লাভ করেন। দিব্য ও ভীমের স্মৃতি বিজড়িত বহু কীর্ত্তি চিহ্ন উত্তরবঙ্গের নানাস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ("জয়পুরহাট" ও "বগুড়া" দ্রষ্টব্য।) মহীপালের পুত্র রামপাল অনন্ত সামন্ত চক্রের সহায়তায় ভীমকে যুদ্ধে নিহত করিয়া পিতৃভূমির পুনরুদ্ধার করেন। এই আখ্যায়িকা অবলম্বনে রামপালের মহাসন্ধিবিগ্রহিক প্রজাপতি নন্দীর পুত্র সন্ধ্যাকর নন্দী "রামচরিতম্" নামক এক দ্ব্যর্থ সূচক সংস্কৃত কাব্য রচনা করেন। ইহার প্রত্যেক শ্লোকেরই দুইভাবে অর্থ করা যাইতে পারে, এক অর্থে রামপালের ভীমকে নিধন করিয়া বরেন্দ্রী ভূমির উদ্ধার ও অপর অর্থে রাম চন্দ্র কর্ত্তৃক রাবণকে বধ করিয়া সীতার উদ্ধার সাধন—এই দুই প্রকার অর্থই

হইতে পারে। এই কাব্য রচনা করিয়া কবি সন্ধ্যাকর নন্দী "কলিকাল বাল্মীকি" উপাধিতে পরিচিত হন। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইতে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে "দিব্য স্মৃতি বার্ষিকী উৎসব" অনুষ্ঠিত হইতেছে।

তিলকপুর—কলিকাতা হইতে ১৭৯ মাইল। স্টেশনের ৫ মাইল পূর্ব্বদিকে কলিঞ্জগ্রাম অবস্থিত। একটি মাটীর উচ্চ স্তূপের উপর ভাঙ্গা মন্দিরে কলিঞ্জেশ্বরী দেবীমূর্ত্তির ভগ্ন পদদ্বয় মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে এবং উহাই পূজা পাইতেছে। মন্দিরের সম্মুখে অবস্থিত জলাশয়টি দিনাজপুরের জমিদার মহারাজ গিরিজানাথ রায় কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়াছে। নিকটে একটি পুরাতন শিবমন্দির বর্ত্তমান। কথিত আছে, "তারা-রহস্য" প্রণেতা সাধক ব্রহ্মানন্দ কলিঞ্জেশ্বরীর আরাধনা করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। এককালে গ্রামটি সমৃদ্ধ ছিল।



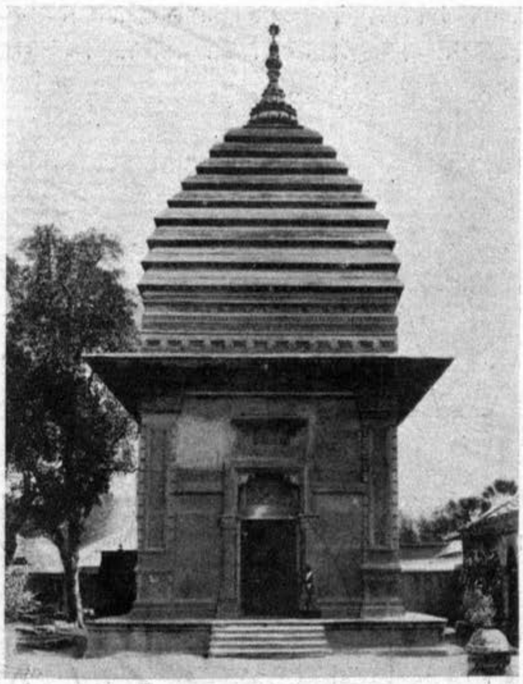
গোপীনাথ, বিগ্রহ গোপীনাথপুর

কলিঞ্জগ্রামের দেড় মাইল উত্তরে রায়কালী গ্রামে কয়েক ঘর কায়স্থ জমিদারের বাস। এই গ্রামে কুষানবংশজ মহারাজ বাসুদেবের একটি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। মুদ্রার রাজ্যকাল ৬৫ শকাব্দ এবং গ্রীক অক্ষরে পহ্লবী ভাষায় লেখা। মুদ্রার একদিকে চতুর্ম্মুখ মহাদেব ও অপরদিকে দণ্ডায়মান রাজমূর্ত্তি।

নিকটস্থ **ভাণ্ডারগাঁর** ঝড়ু তর্কালঙ্কারের নাম সুপ্রসিদ্ধ। এতদঞ্চলে প্রবাদ আছে, বিচারে "ঝড়বৎ ঝড়ু"।

আক্কেলপুর—কলিকাতা হইতে ১৮৫ মাইল দূর।

এই স্টেশন হইতে পাঁচ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত গোপীনাথপুর গ্রামে প্রায় চারি শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে গোপীনাথদেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। মুর্শিদাবাদ জেলার আমলই গ্রামনিবাসী নন্দরাম সিংহ নামক জনৈক উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ অদ্বৈতাচার্য্যের স্ত্রী সীতাদেবীর নিকট নবদ্বীপে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া গোপীভাবে সাধনা করিতে আরম্ভ করেন এবং উহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়া "নন্দিনীপ্রিয়া" নামে পরিচিত হন। তিনিই পরে এই গ্রামে আসিয়া গোপীনাথ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবা করিতে থাকেন। কথিত আছে, তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া তখনকার বাদশাহ মন্দিরের ব্যয়ের জন্য গোপালপুর মহাল দান করেন। গোপীনাথ দেব অষ্টসখীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। কানাই, বলাই, রাধাকৃষ্ণ ও গরুড়মূর্ত্তি মূল বিগ্রহের



গোপীনাথদেবের মন্দির, গোপীনাথপুর

চতুর্দ্দিকে বিদ্যমান। গোপীনাথের প্রাচীন মন্দির ১৩০২ সালের ভূমিকম্পে ভূমিসাৎ হয়। বর্ত্তমান মন্দিরটি উচ্চতায় প্রায় ৫০ ফুট হইবে। এখানে প্রত্যহ ২৫ সের চাউলের ভোগ দেওয়া হয় এবং অতিথি অভ্যাগতগণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়া থাকে। গোপীনাথ সম্বন্ধে বহু অলৌকিক গল্প শুনা যায়।

দোলযাত্রা উপলক্ষে পঞ্চমদোলের দিন হইতে গোপীনাথপুরের মন্দিরপ্রাঙ্গণে বারদিন স্থায়ী একটি বিরাট মেলা বসে। এই মেলায় বাংলাদেশ তথা ভারতের নানাস্থান হইতে গরু, মহিষ, উট, ঘোড়া, দুম্বা প্রভৃতির আমদানী হয় এবং